সারনাথ বিবরণ।

শ্রীভবতোষ মজুমদার প্রণীত

কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ।

কলিকাতা : গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া
সেণ্ট্রাল পাবলিকেসন্ ব্রাঞ্চ।
১৯২৭।

যিনি

আজ চব্বিশ বৎসর কাল

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষরূপে ভারতের প্রাচীন

কীর্ত্তিনিদর্শনসমূহ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়া

অতীতের গৌরবময় কাহিনীর

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন

সেই

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত সার জন মার্শেল, কেটি, সি-আই-ই, এম-এ,

লিট্-ডি, পি-এচ্-ডি, এফ্-এস্-এ, অনারারি

এ-আর-আই-বি-এ,

মহোদয়ের করকমলে

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

অর্পিত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী দর্শকগণের সৌকর্য্যার্থে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী কৃত সারনাথ গাইডের একটী বাঙ্গালা সংস্করণ সঙ্কলন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন উক্ত পুস্তকের একটী অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিব এইরূপ কল্পনা ছিল। কিন্তু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সারনাথের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও শিল্পকলার বিবরণ উপলক্ষ করিয়া কয়েকটী পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিয়া না দিলে উহা সাধারণের পক্ষে অসম্পূর্ণ মনে হইতে পারে। তদনুসারে কতিপয় অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদটী সম্পূর্ণভাবে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদটী অংশতঃ সাহনী মহাশয়ের পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ সার জন মার্শেল মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশে অনুমতি দিয়া আমায় ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে মৌর্য্য, শুঙ্গ ও গুপ্ত যুগের শিল্পের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার জন্যও আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিকট ঋণী। স্বর্গগত ডাক্তার স্পুনারের স্মৃতির সহিত আমার গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে জড়িত। তাঁহারই অনুমতি ক্রমে আমি কিছুকাল কাশীতে থাকিয়া সারনাথের যাবতীয় প্রত্নবস্তুর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় আমাকে নানা উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমার পাণ্ডুলিপি স্থানে স্থানে সংশোধিত করিয়া এবং একটী ভূমিকা সংযোজিত করিয়া দিয়া গ্রন্থের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী মহাশয় এই গ্রন্থে ব্যবহারের জন্য একটী অত্যাবশ্যক মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এই সকল মহাত্মার নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

সারনাথের ইতিবৃত্ত উপযুক্ত রূপে আলোচনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও অনেকের নিকট অপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে দুইটী চরম পন্থাই পরিহার্য্য বিবেচনা করিয়া আমি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছি। এক্ষণে এই পুস্তকে যদি দর্শকগণের স্বল্পমাত্রও উপকার সাধিত হয় তাহা হইলেই আমার চেষ্টা সফল জ্ঞান করিব। এবিষয়ে যাঁহারা আরও অধিক অনুসন্ধান করিতে চাহেন তাঁহারা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী কৃত Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath গ্রন্থে নিবদ্ধ গ্রন্থতালিকায় এতদ্বিষয়ক অত্যাবশ্যক গ্রন্থাবলীর নাম প্রাপ্ত হইবেন।

শিমলা, শ্রীভবতোষ মজুমদার।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৪।

বিষয় সূচী।

তৃতীয় অধ্যায়—ধ্বংসাবশেষ।

পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়—মিউজিয়ম।

পঞ্চম অধ্যায়—শিল্প

পরিশিষ্ট।

চিত্রসূচী

ভূমিকা।

ধর্ম্মচক্র।

বৌদ্ধগণের চারিটী মহাতীর্থ, গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান কপিল বস্তু; সম্বোধি লাভের স্থান উরুবিল্ব (বোধগয়া); প্রথম ধর্ম্ম ব্যাখ্যার স্থান সারনাথ; এবং মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান কুশীনগর। কপিলবস্তু এবং কুশীনগর বুদ্ধের মহিমায় মহিমান্বিত। কিন্তু বোধগয়া (উরুবিল্ব) এবং সারনাথ বেদপন্থিগণের দুইটী মহাতীর্থ গয়ার এবং বারাণসীর নিকটবর্ত্তী। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় ব্যাপারে এই দুইটী স্থানের আচার নীতির যে কতকটা প্রভাব ছিল এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধ সূত্র অপেক্ষা নিঃসংশয়রূপে প্রাচীনতর কোন গ্রন্থে গয়ার উল্লেখ দেখা যায় না। গয়ার চারিদিকে যাঁহারা বাস করিতেন বৈদিকযুগে সেই মগধগণ বেদবাহ্য ব্রাত্য বলিয়া ঘৃণিত ছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে গয়াপ্রদেশবাসীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না যে কিরূপ ভাবের আবহাওয়ার ভিতর থাকিয়া গৌতম উরুবিল্বে ছয় বৎসর কাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং শেষে সম্বোধিলাভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু বারাণসীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তির সময়ে যে কি প্রকার ভাবের হাওয়া বহিতে ছিল বৈদিকসাহিত্যে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণে, কোন কোন প্রাচীন উপনিষদে, এবং শ্রৌতসূত্রে কাশ নামক জনগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কাশিগণের রাজাকে কাশ্য বলা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে বারাণসীর নাম দৃষ্ট হয় না। অথর্ব্ববেদে বরণাবতী নদীর নাম উল্লিখিত থাকায় অধ্যাপক মেকডোনেল ও কিথ্ মনে করেন যে বারাণসী নগরী অতি প্রাচীন(১)। ব্যাকরণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির "বিদূরাঞ্ঞ্যঃ" (৪।৩।৮৪) সূত্রের ভাষ্যে কাত্যায়নের এই বার্ত্তিকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"বালবায়ো বিদূরংচ প্রকৃত্যন্তরমেব বা।
নবৈ তত্রেতি চেদ্ব্রুয়াজ্জিত্বরীবদুপাচরেৎ ॥"

"বিদূবাঞ্ঞ্যঃ" সূত্রের অর্থ, বিদূর নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন মণি অর্থে বিদূর শব্দের উত্তর ঞ্য প্রত্যয় যোগে বৈদূর্য্য পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদূর্য্যমণি বিদূর নামক কোন পর্ব্বতে উৎপন্ন হয় না, বালবায় নামক পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। এই জন্য এই বার্ত্তিকে কাত্যায়ন বলিয়াছেন, "বিদূর বালবায়ের প্রতিশব্দ মাত্র। যদি বলা হয় যে বালবায়কে বিদূর বলা যাইতে পারে না; উত্তরে বলা যায়, যেমন বণিকেরা বারাণসীকে জিত্বরী বলে, তেমনি বৈয়াকরণেরা বালবায়কে বিদূর বলে।" বার্ত্তিকের "জিত্বরীবদুপাচরেৎ" পদের পতঞ্জলি এই প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন –

"বণিজো বারাণসীং জিত্বরীত্যুপাচরন্তি। এবং বৈয়াকরণা বালবায়ং বিদূর ইত্যুপাচরন্তি।"

"বণিকগণ বারাণসী নগরীকে জিত্বরী নামে অভিহিত করে; এইরূপ বৈয়াকরণেরা বালবায়কে বিদূর বলে।"

---

(১) *Vedic Index*, Vol. I, p. 153.

পতঞ্জলি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দের মধ্যভাগে মহাভাষ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে কাত্যা-য়নকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পতঞ্জলির সময়ে কাত্যায়ন মুনিঋষিবৎ গণ্য হইতে ছিলেন, অর্থাৎ পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের কালের মধ্যে যথেষ্ট (অন্যূন শতাধিক বৎসর) ব্যবধান কল্পনা করা যাইতে পারে। জিত্বরী শব্দের অর্থ জয়শীলা। অতএব কাত্যায়নের এই বার্ত্তিক হইতে দেখা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দে বারাণসী বাণিজ্যের এমন একটা প্রসিদ্ধ স্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং সেখানে ক্রয় বিক্রয় এমন লাভজনক ছিল যে বণিকেরা বারাণসীকে জিত্বরী নাম দিয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধসূত্রে বারাণসী বরাবরই কাশিজনপদের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে বারাণসী একটি প্রধান নগর এবং কাশিজনপদের রাজধানী ছিল।

শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে (১৬।২৯।৫) কথিত হইয়াছে,

"এতে হ জলো জাতূকর্ণ্য ইষ্ট্বা ত্রয়াণাং নিগুস্থানাং
পুরোধাং প্রাপ কাশ্যবৈদেহযোঃ কৌসল্যস্য চ।"

"এই ইষ্টির দ্বারা জলজাতুকর্ণ্য কাশিরাজ, বিদেহরাজ ও কোসলরাজ এই তিনটা রাজবংশের পৌরহিত্য লাভ করিয়া ছিলেন।"

এই বচন হইতে দেখা যায় কোসল, কাশি, এবং বিদেহ গণের মধ্যে তখন আচারের ঐক্য ছিল। বৈদিকযুগে একদিকে যেমন কুরুপাঞ্চালগণের মধ্যে আচার বিষয়ে ঐক্য ছিল তেমনি

আর একদিকে কাশি ও বিদেহগণের মধ্যেও ঐক্য ছিল। শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।১৯) এই উপাখ্যানটী আছে। ভরতরাজ শতানীক সাত্রাজিত কাশিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞের অশ্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকার লিখিয়াছেন, তদবধি কাশিগণ যজ্ঞাগ্নি জ্বালিত করেন না। এই আখ্যানে দেখা যায় শতপথব্রাহ্মণের এই অংশ রচনার সময়ে কাশিজনপদে বৈদিক যাগযজ্ঞ লোপ পাইতেছিল। কিন্তু কাশির রাজধানীতে যে জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন হইত উপনিষদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যকে (২।১।১) এবং কৌষীতকী উপনিষদে (৪।১) বর্ণিত হইয়াছে, বালাকি নামক একজন ব্রাহ্মণ কাশিরাজ অজাতশত্রুর নিকট আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে জনপদে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত হইত না অথচ উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা আলোচিত হইত সেখানকার ভাবের আবহাওয়া অবশ্য গৌতমবুদ্ধের ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনুকূল ছিল। পালি দীর্ঘাগমের (দীঘনিকায়) অন্তর্গত মহাপদান সুত্তন্ত অনুসারে গৌতমবুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্যপবুদ্ধ বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জৈনদিগের ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জন্মস্থানও বারাণসী। কাশ্যপবুদ্ধ এবং পার্শ্বনাথের জন্মসম্বন্ধীয় প্রাচীন কিম্বদন্তী সাক্ষ্য দান করিতেছে যে প্রাচীন কাল হইতেই বারাণসী বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের পালয়িত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছিল। মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত ঘটিকারসুত্তে (৮১) দেখা যায় কাশ্যপবুদ্ধও সময় সময় ঋষিপতন মৃগদাবে বাস করিতেন।

গৌতমবুদ্ধ সম্বোধলাভের পর সারনাথে যে সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহার শ্রোতা ছিলেন পঞ্চভদ্রবর্গীয় নামে পরিচিত পাঁচজন ভিক্ষু এবং এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রব্রজিত বা সংসারত্যাগী ভিক্ষুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। এই প্রকার ভিক্ষুগণ তখন শ্রমণ নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রমণগণ আদৌ বেদপন্থী ছিলেন এবং কালক্রমে অনেক শ্রমণ বেদমার্গ ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে বিভিন্ন শ্রমণ্যমার্গকে বেদমার্গেরই শাখা প্রশাখা রূপে গণ্য করিতে হইবে। শ্রমণ শব্দের অর্থ অভীষ্ট লাভের জন্য উপবাসাদি শ্রম বা কষ্টকর কর্ম্মের সম্পাদক। ঋগ্‌বেদে যাগ যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে উপবাসাদি তপশ্চরণের কথা আছে। যজুর্বেদে তপশ্চরণের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে; কথিত হইয়াছে, প্রজাপতি তপশ্চরণ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩।১।১)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২।৭) এই আখ্যায়িকাটী দৃষ্ট হয়—

"বাতরশনা নামক একদল ঋষি শ্রমণ (তপস্বী) এবং ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। অভীষ্টলাভের জন্য কয়েকজন ঋষি তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়া ছিলেন। তাঁহারা (বাতরশনা নামক ঋষিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া) অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন এবং কুশ্মাণ্ড নামক মন্ত্রবাক্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (অপর ঋষিগণ) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়া কুশ্মাণ্ড মন্ত্রবাক্যে বাত-রশনাগণের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বাত-রশনাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি নিমিত্ত আপনারা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।' বাতরশনাগণ বলিলেন, 'হে ভগবদগণ

আপনাদিগকে নমস্কার করি। আপনারা আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছেন, বলুন কি উপায়ে আমরা আপনাদিগের সেবা করিব।' অপর ঋষিরা বাতরশনাগণকে বলিলেন, 'যাহাতে আমরা পাপরহিত হইতে পারি, আমাদিগকে সেই শুদ্ধির উপায় বলুন।' তখন বাতরশনাগণ (শুদ্ধিপ্রদ) এই কয়েকটী সূক্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন . . .

. . . . অপর ঋষিগণ এই (কুষ্মাণ্ডমন্ত্রের দ্বারা) হোম করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। যাগযজ্ঞের আরম্ভে কুষ্মাণ্ডহোম করিয়া পাপমুক্ত হইলে যজমানের দেবলোক প্রাপ্তি হয়।"

বোধায়ন শ্রৌতসূত্রে (১৬।৩০) সত্রয়ন যাগের অধিকারীকে শ্রমণ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৩।২২) শ্রমণ ও তাপসের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ পালি নিকায়ে শ্রমণগণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগি সম্প্রদায়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পাণিনির ব্যাকরণের একটী (২।৪।৯) সূত্রে বিহিত হইয়াছে, যে সকল প্রাণীর মধ্যে বিরোধ শাশ্বতিক অর্থাৎ চিরন্তন সেই সকল প্রাণিবাচক শব্দের দ্বন্দ্বসমাস হইলে তাহা একবচনান্ত হইবে। এই সূত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বার্ত্তিকের ভাষ্যে পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—

"যেষাং চ বিরোধ ইত্যস্যাবকাশঃ। শ্রমণব্রাহ্মণম্।"

"যাহাদের মধ্যে বিরোধ চিরন্তন তাহাদের সম্বন্ধে এই সূত্রের প্রয়োগ হইবে। যথা শ্রমণব্রাহ্মণম।"

পতঞ্জলির মহাভাষ্যের রচনাকাল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ দুইটী বিরোধী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং এই বিরোধ চিরন্তন বলিয়া তৎকালের লোকের ধারণা ছিল। এখানে ব্রাহ্মণশব্দের অর্থ কেবল জাতি ব্রাহ্মণ নহে, যাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণকারী এইরূপ ব্রাহ্মণ।

এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিলে অনুমান হয়, উপবাসাদি তপশ্চরণশীল ঊর্দ্ধরেতা কর্ম্মকাণ্ডপন্থী ঋষিগণ আদৌ শ্রমণ নামে পরিচিত ছিলেন। জন্মান্তরবাদের প্রচার এবং যাগযজ্ঞ ও তপস্যার ফলে দেবলোক লাভ হইলেও সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্ষয় হওয়ার পর দেবলোক হইতে পতন এবং হীনযোনিতে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আছে এই প্রকার সংস্কার একান্ত নিষ্ঠাবান আদিম শ্রমণগণকে কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে চিরতরে মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞানের অনুশীলনে ব্রতী করিয়াছিল। তদবধি কর্ম্মকাণ্ডপন্থী ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানপন্থী শ্রমণ প্রতিযোগি সম্প্রদায়রূপে গণ্য হইয়াছিল। যেখানে বেদাবিহিত কর্ম্ম বন্ধনের কারণ এবং শ্রমণের সাধ্য জ্ঞান মুক্তির কারণ বলিয়া গণ্য হয় সেখানে কর্ম্মকাণ্ডপন্থী ব্রাহ্মণের সহিত মোক্ষপন্থী শ্রমণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, গৌতমবুদ্ধের সমসময়ে শাক্যপুত্রীয় বা বৌদ্ধশ্রমণ ছাড়া কর্ম্মকাণ্ড বিরোধী নির্গ্রন্থ বা জৈন, মস্করী বা আজীবিক এবং আরও কতক গুলি শ্রমণসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। জৈনগণ আমাদের

সুপরিচিত। পাণিনির ব্যাকরণে (৬।১।১৫৪) মস্করী পরিব্রাজকের উল্লেখ আছে এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মস্করী শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রদান করিয়াছেন—

"মা কৃত কর্মাণি মা কৃত কর্মাণি শান্তির্বঃ শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজকঃ।"

"'কর্মানুষ্ঠান করিওনা, কর্মানুষ্ঠান করিওনা, শান্তিই তোমাদিগের শ্রেয়ঃ', (যাঁহারা) এই প্রকার বলিয়া থাকেন (তাঁহাদিগকে) মস্করী (মা × কৃ × ইনি) পরিব্রাজক বলে।"

মস্করী (আজীবক) পরিব্রাজকেরা সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানই নিষেধ করিতেন এবং জীব চতুরশীতি যোনি ভ্রমণের ফলে আপনা আপনি মুক্তিলাভ করিবে এইরূপ প্রচার করিতেন। কিন্তু স্বর্গলাভের অর্থাৎ বন্ধনের কারণ বৈদিক যাগযজ্ঞ, বিশেষতঃ যজ্ঞে প্রাণিহত্যা, বোধ হয় তখনকার কোন শ্রেণীর শ্রমণ বা পরিব্রাজকই অনুমোদন করিতেন না। সুতরাং তখন শ্রমণে ব্রাহ্মণে বিরোধ অনিবার্য্য। কিন্তু শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বিরোধ পাশ্চাত্য জগতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের সহিত তুলনীয় নহে। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম যে নিষ্ফল এমন কথা শ্রমণেরা বলিতেন না। পালি দীঘনিকায় বা দীর্ঘাগমের অন্তর্গত কূটদন্ত সুত্তে গৌতম বুদ্ধ বলিতেছেন, তিনি পূর্ব্বজন্মে একবার পুরোহিতরূপে রাজা মহাবিজিতকে স্বর্গসাধক (অবশ্যই প্রাণিহিংসারহিত) এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। "সুত্তনিপাতের" ব্রাহ্মণ-ধম্মিকসুত্তে গোতমবুদ্ধ বলিতেছেন, পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা সংযমী ছিলেন এবং যজ্ঞে প্রাণিহিংসা করিতেন না; কালক্রমে অব-

নতির ফলে ব্রাহ্মণেরা লোভী হইয়াছেন এবং যজ্ঞে পশুহিংসা আরম্ভ করিয়াছেন।* যাগযজ্ঞের ফলে মরণশীল দেবগণের লোক লাভ হইতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হইতে পারে না, সুতরাং যাহাতে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় এরূপ সাধন করাই মানুষের কর্ত্তব্য। সকল সম্প্রদায়ের শ্রমণের মতেই এইরূপ নির্ব্বাণমুক্তি গৃহত্যাগী ভিক্ষুর লভ্য, গৃহীর লভ্য নহে। সুত্তনিপাতের অন্তর্গত ধম্মিকসুত্তে বুদ্ধ বলিতেছেন, একান্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ (শ্রাবক বা উপাসক) মৃত্যুর পর স্বয়ংপ্রভানামক দেবগণেরলোক প্রাপ্ত হইবেন। নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে হইলে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। পরিব্রাজকের বা শ্রমণের প্রধান কার্য্য ছিল তপশ্চরণ ও ধ্যান। কিন্তু সকল শ্রেণীর শ্রমণ অবশ্যই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন না। গৌতমবুদ্ধ গৃহত্যাগের পর এবং বোধিলাভের পূর্ব্বে উরুবিল্বে ছয় বৎসরকাল কঠোর তপশ্চরণ (দুষ্করচর্য্যা) করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া ছিল। তারপর তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুষ্করচর্য্যার দ্বারা মুক্তিদায়ক বোধি বা জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না, বোধি লাভের জন্য ধ্যানের প্রয়োজন। সুতরাং দুষ্করচর্য্যা ভঙ্গ করিয়া তিনি স্নানাহার করিলেন এবং বোধিবৃক্ষের মূলে বসিয়া ধ্যানবলে

* দীঘনিকায়ের অন্তর্গত "অগ্গঞ্ঞ সুত্তে" ব্রাহ্মণবর্ণের উৎপত্তির বিবরণ দ্রষ্টব্য। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত "তেবিজ্জ সুত্তে" প্রাচীন ঋষিগণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে। তেবিজ্জ সুত্তের যাহা লক্ষ্য, ব্রহ্মাতে (ব্রহ্মে নহে) লীন হওয়া অথবা ব্রহ্মলোক লাভ তাহা অন্যান্য প্রাচীন সুত্তের উপদিষ্ট অচ্যুৎ পদলাভের বিরোধী। সুতরাং তেবিজ্জ সুত্তকে স্বতন্ত্র রচনা মনে করাই কর্ত্তব্য।

মোক্ষদায়ক সম্যক সম্বোধি লাভ করিলেন। সারনাথে পঞ্চভদ্র-বর্গীয়ের নিকট প্রচারিত "ধম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্রে" এই অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ প্রথমতঃ শ্রমণের জন্য মধ্যমপ্রতিপদা বা মধ্যপথ উপদিষ্ট হইয়াছে। গৌতমবুদ্ধ বলিতেছেন, প্রব্রজিত শ্রমণ দুই প্রকার অনাচার পরিত্যাগ করিবেন: সাধারণ সংসারী লোকের মত তিনি ভোগবিলাসরত হইবেন না, অপরপক্ষে, কঠোর তপশ্চরণ করিয়া শরীরকেও ক্লেশ দিবেন না। ভিক্ষুর মধ্যপথ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য: অষ্টাঙ্গিক মার্গ সেই মধ্যপথ। গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত শ্রমণ ধর্ম্মের একটী প্রধান লক্ষণ অন্তো-বক্রম বা বাড়াবাড়ির পরিহার। ধম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্রে প্রচারিত আর একটী তথ্য, চারি প্রকার আর্য্য সত্য। যথা, (১) দুঃখ; (২) দুঃখ সমুদয়; (৩) দুঃখ নিরোধ, (৪) দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা পথ। দুঃখ কি? জাতি (জন্ম) দুঃখ, জরা (বার্দ্ধক্য) দুঃখ ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ প্রিয়বিয়োগ দুঃখ। দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের উৎপত্তির কারণ কি? তৃষ্ণা। প্রথম ও দ্বিতীয় আর্য্যসত্যে যে তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে প্রতীত্যসমুৎপাদে বা দ্বাদশনিদানে। কথিত আছে সম্বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌতম দ্বাদশ নিদান বা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল অনুভব করিয়াছিলেন। দ্বাদশ নিদান এই—

(১২) জরামরণের কারণ জাতি (জন্ম)।

(১১) জাতির (জন্মের) কারণ ভব (জন্ম গ্রহণের দিকে ঝোঁক)।

(১০) ভবের কারণ উপাদান (কর্ম্মের ইচ্ছা)।

(৯) উপাদানের কারণ তৃষ্ণা।

(৮) তৃষ্ণার কারণ বেদনা (ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্রবজনিত জ্ঞান)।

(৭) বেদনার কারণ সংস্পর্শ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্রব)।

(৬) সংস্পর্শের কারণ ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়)।

(৫) ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ (দেহ ও মন)।

(৪) নামরূপের কারণ বিজ্ঞান (পুনর্জ্জন্ম)।

(৩) বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার (কর্ম্ম)।

(২) সংস্কারের কারণ অবিদ্যা (অজ্ঞান)

(১) অবিদ্যা দুঃখের মূল কারণ।

এই দ্বাদশ নিদানের দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, মানুষের দুঃখের কারণ, দ্বিতীয় আর্য্যসত্য দুঃখসমুদয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্ব জন্মের (১) অজ্ঞানের ফলে সংস্কার বা কৃতকর্ম্মের সংস্কার এবং সেই সংস্কারের ফলে পুনর্জ্জন্ম। ৩ হইতে ১০ দফায় মানুষের বর্ত্তমান জীবনের কথা নিবদ্ধ হইয়াছে। পুনর্জ্জন্ম হইলেই দেহমনের উৎপত্তি হয়। ষড়েন্দ্রিয় দেহমনের অন্তী- ভূত। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে জ্ঞানের উৎপত্তি এবং

জ্ঞান হইতে তৃষ্ণার বা বাসনার উৎপত্তি। তৃষ্ণার ফলে ভোগে আসক্তি। এই আসক্তি জন্মগ্রহণের ঝোঁক উৎপাদন করে এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে জাত বা জন্ম (১১) এবং জরামরণ (১২) হয়।

অবিদ্যা যেরূপ দুঃখের মূলীভূত কারণ, অবিদ্যার নিরোধও তেমনি দুঃখ নিরোধের উপায়। অবিদ্যা না থাকিলে সংস্কার থাকিবে না; সংস্কার না থাকিলে বিজ্ঞান থাকিবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত দুঃখদায়ক জাতি জরামরণ হইবে না। অনুলোম রীতিতে উক্ত দ্বাদশ নিদানে যেমন দ্বিতীয় আর্য্যসত্য, দুঃখ সমুদয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তেমনি প্রতিলোম রীতিতে উক্ত দ্বাদশ নিদানে তৃতীয় আর্য্যসত্য, দুঃখনিরোধ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-সূত্রে গৌতমবুদ্ধের ধর্ম্মের সার কথা পাওয়া যায়। সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরাই এই সূত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে এই সূত্র গৌতমবুদ্ধ কর্ত্তৃক সারনাথে বিবৃত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেই সারনাথ একটা মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এপর্য্যন্ত সারনাথে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যুগের, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই দেড় হাজার বৎসরের নিদর্শন ধারাবাহিক রূপে পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই দেড় হাজার বৎসরের অন্তর্গত বিভিন্ন যুগের চমৎকারজনক বহু নিদর্শন ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীমান ভবতোষ মজুমদার

যোগ্যতার সহিত তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী প্রণীত ইংরাজী সারনাথ বিবরণ অবলম্বনে এই পরিচয় রচিত হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের মূর্ত্তি পরিচয়ে অনেক অভিনব তথ্যও নিবদ্ধ হইয়াছে। সারনাথের ধ্বংসাবশেষের এবং মূর্ত্তির পরিচয় ছাড়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ভাস্কর্য্যের ধারাবাহিক বিবরণ নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থখানির পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। দর্শকগণ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের সহায়তায় সারনাথের ভগ্নাবশেষ এবং মিউজিয়ম দেখিয়া অবসর মত গ্রন্থের অন্যান্য অংশ, বিশেষতঃ দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায়, পাঠ করিলে সারনাথের স্মৃতি অধিকতর উপভোগ্য মনে করিবেন এমন আশা করা যাইতে পারে।

রমাপ্রসাদ চন্দ।

সারনাথ বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন।

গৌতম বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত কপিলবস্তু নামক নগরে ইক্ষ্বাকু বংশের অন্যতম শাখা শাক্যকুলে গৌতমবুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌতমবুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যদিগের রাজা ছিলেন। পিতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন সিদ্ধার্থ বা সর্ব্বার্থসিদ্ধ। পিতৃকুলের গোত্র অনুসারে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত ছিলেন এবং উত্তর কালে বোধিলাভের পর বুদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই বুদ্ধ ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ নামে সুপরিচিত। কুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে এককালে মুক্তি লাভ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে রাজগৃহের তৎকালীন রাজা বিম্বিসার তরুণ সন্ন্যাসীকে রাজ্যের

অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ অসম্মত হইযা রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আবাড় কালাম এবং রুদ্রক রামপুত্র নামক দুইজন সন্ন্যাসীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই জনের নিকট যাহা কিছু শিখিবার তাহা শিখিয়া সিদ্ধার্থ গয়ার সমীপস্থ নৈরঞ্জনা (বর্ত্তমান লীলাজান) নদীর তীরবর্ত্তী উরুবেলা গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্রিয়, মহানাম, ও অশ্বজিৎ নামধেয় পাঁচজন ভিক্ষু তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহারা বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে পঞ্চভদ্রবর্গীয় নামে প্রসিদ্ধ। ছয় বৎসর কাল কঠোর তপশ্চরণের পর সিদ্ধার্থ বুঝিতে পারিলেন যে কেবল তপস্যা অর্থাৎ উপবাসাদি করিয়া শরীরকে কষ্ট দিলে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহারাদি আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া কৌণ্ডিন্যাদি পঞ্চ অনুচর মনে করিলেন, ছয় বৎসর কাল কঠোর তপশ্চরণ করিয়া যখন ইনি বোধিলাভ করিতে পারিলেন না তখন ইঁহার বোধি লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং তাঁহারা সিদ্ধার্থের সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া বারাণসী নগরীর উপকণ্ঠস্থিত ঋষিপতন বা মৃগদাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে উরুবেলায় একদিন রাত্রিতে বোধিসত্ত্ব[১] পাঁচটী স্বপ্ন

(১) ভাবী বুদ্ধ।

দেখিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গের পর তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে পরদিবসই তিনি বোধিলাভ করিবেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বোধিসত্ত্ব একটা ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে উরুবেলার গ্রামণী বা গ্রামাধিপতির দুহিতা সুজাতা আসিয়া তাঁহাকে স্বর্ণপাত্রে পায়স নিবেদন করিলেন। পাত্র সহ পায়স লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনার ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং স্নানান্তে কৌপীন বহির্বাস পরিধান করিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে পাত্রটা নৈরঞ্জনার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া সিদ্ধার্থ বলিলেন, "যদি আজ আমার বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকে তবে এই পাত্র যেন স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া যায়।" পাত্র যথার্থই স্রোতের প্রতিকূলে ভাসিয়া গিয়া অবশেষে নাগলোকে উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় সিদ্ধার্থ নদীতীরের অদূরস্থিত একটা পিপ্পল বা ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে উপনীত হইলেন এবং উহার পূর্ব্বদিকে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ং চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

"আমার শরীর শুষ্ক হউক, অস্থি, চর্ম্ম ও মাংস একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় যা'ক, তথাপি বোধিলাভ না করিয়া আমি এই আসন পরিত্যাগ করিব না।" কথিত আছে যে এই সময় সাধুজনের চিরশত্রু মার বা কামদেব সসৈন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নানা উপায়ে বোধিমার্গ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়াছিল তখন মার বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি যে দান করিয়াছ তাহার সাক্ষী কে?" বোধিসত্ত্ব তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও রাজকুমার বিশ্বন্তর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি যে সাত শত মহাদান করিয়াছিলাম এই পৃথিবী তাহার সাক্ষ্য দান করিবে।" পৃথিবী বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ইহা ধ্রুব সত্য।" মার পরাভূত হইয়া সদলবলে পলায়ন করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ পরমার্থজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানের বলে রজনীর প্রথম যামে বোধিসত্ত্ব দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন এবং দিব্যচক্ষুর দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিলেন; রজনীর মধ্যম যামে তিনি দিব্যদৃষ্টিতে সমগ্র জীবজগতের পরিণতি প্রত্যক্ষ করিলেন; রজনীর শেষ যামে ব্যথিত হৃদয়ে জীবের দুর্গতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উহার কারণ

পরম্পরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন জরা, মৃত্যু, জন্ম প্রভৃতি সকলের মূলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান এবং অবিদ্যার নাশ হইলেই জীবের সকল প্রকার দুঃখের শেষ অর্থাৎ মুক্তি হইতে পারে। তিনি দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের সমুদয় বা কারণ, দুঃখের নিরোধ বা নাশ এবং দুঃখ নিরোধের পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন তিনি সম্বোধি বা সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বুদ্ধ বা তথাগত হইয়াছেন, আর তাঁহাকে জন্মমরণের বশীভূত হইতে হইবে না। ঠিক প্রত্যুষে এই ঘটনা ঘটিল। সম্বোধি লাভের পর মোক্ষ সুখ অনুভব করিবার জন্য গৌতম প্রথম সপ্তাহ বোধিবৃক্ষের পাদমূলে অবস্থান করিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহ অজপালন্যগ্রোধ মূলে উপবেশন করিয়া কাটাইলেন। তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দ গাছের তলায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। এই সময় অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় নাগরাজ মুচলিন্দ ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। মুচলিন্দ বৃক্ষমূলে সাত দিন থাকিয়া বুদ্ধ রাজায়তন বৃক্ষের মূলে আসিয়া বসিলেন এবং এখানেও সাত দিন কাটাইলেন। এই সময়ে তপুস্স এবং ভল্লিক নামক দুইজন বণিক উৎকল হইতে আসিবার পথে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আহারার্থ বুদ্ধদেবকে পিষ্টক ও মধু নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের নিকট কোনও ভোজন পাত্র না থাকায় গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র, নাগরাজ বিরূপাক্ষ, কুম্ভাণ্ডরাজ বিরুধক এবং যক্ষরাজ বৈশ্রবণ এই চারিজন দিক্পাল চারিটী শিলা পাত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতায় চারিটী পাত্র একটীতে পরিণত হইয়াছিল এবং তিনি উহাতে আহার করিয়াছিলেন। বণিকদ্বয় বুদ্ধ ও ধর্ম্মের শরণাগত হইয়া বুদ্ধের প্রথম উপাসক বা গৃহস্থ শিষ্য হইয়াছিলেন১। তারপর বুদ্ধদেব রাজায়তন বৃক্ষের মূল ত্যাগ করিয়া পুনরায় অজপালন্যগ্রোধের তলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি যে মহাসত্য লাভ করিয়াছেন তাহা জগৎ সমক্ষে প্রচার করিবেন কি না ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—

"পাতুরহোসি মগধেসু পুব্বে
ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো।
অপাপুর্ এতম্ অমতস্স দ্বারম্
সুন্নতু ধম্মম্ বিমলেনানুবুদ্ধম্" ॥

"এখন পঙ্কিলহৃদয় শিক্ষকগণের উদ্ভাবিত ধর্ম্ম মগধে প্রচলিত আছে; তুমি অমরত্বের দ্বার খুলিয়া

(১) ললিতবিস্তর, নিদানকথা প্রভৃতি অনুসারে সম্বোধিলাভের পর সপ্তম সপ্তাহে বুদ্ধের সহিত ত্রপুষ ও ভল্লিকের মিলন হয়।

দাও ; লোকে নির্ম্মলহৃদয় বুদ্ধ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম্ম শ্রবণ করুক।” ব্রহ্মার স্তুতি বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবান বুদ্ধদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার নিকট প্রথম তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এবং কোন ব্যক্তিই বা তাঁহার গভীর নীতিবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। তখন তিনি ভাবিলেন, আরাড়-কালাম এবং রুদ্রক-রাম-পুত্রের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারিলেন যে এই দুই জ্ঞানী পুরুষ ইতিমধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তারপর কৌণ্ডিন্যাদি পঞ্চভদ্র-বর্গীয়ের কথা তাঁহার স্মরণ হইল এবং তাঁহাদিগের নিকট প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। পঞ্চভদ্র-বর্গীয় ভিক্ষুগণ কাশী নগরীর নিকটবর্ত্তী মৃগদাব ঋষি-পতনে বাস করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তথাগত তথায় গমন করিলেন।

ঋষিপতন বা মৃগদাব-বর্ত্তমান সারনাথ।

প্রাচীন ঋষিপতন বা মৃগদাব এখন সারনাথ নামে পরিচিত। সারনাথের ধ্বংসাবশেষ বারাণসী নগরের প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে গাজীপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে এই রাজপথ দিয়া বা রেল যোগে সারনাথ যাওয়া যায়। পুরাকালে বারাণসী হইতে এই স্থানে যাইবার একটী সরল পথ ছিল। এই পথের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদের নিকটস্থ পঞ্চগঙ্গাঘাট হইতে একটী পুরাতন

পথ লাটভৈরবের দক্ষিণদিক দিয়া বরুণা নদীর অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রেলপথের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই স্থানে মোগল যুগের তিনটী খিলানযুক্ত একটা পুল ছিল, বন্যার প্রকোপে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সারনাথের ঋষিপতন (পালি ইসিপতন) নাম হইবার কারণ মহাবস্তু অবদান নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। বারাণসীর সার্দ্ধ যোজন দূরে এক মহাবন ছিল এবং তথায় পঞ্চশতজন প্রত্যেক-বুদ্ধ[১] বাস করিতেন। এই পঞ্চশতজন প্রত্যেক-বুদ্ধ আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন তাঁহাদিগের শরীর এই বন খণ্ডে পতিত হওয়ায় এই স্থানের নাম ঋষিপতন হইয়াছিল[২]। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান খৃষ্টীয় পঞ্চম

(১) প্রত্যেকবুদ্ধ — যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করেন কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার করেন না।

(২) ফরাসী পণ্ডিত সেনারের (Mon. E. Senart) মতে 'ঋষিপতন' ঋষি-পত্তন শব্দের অপভ্রংশ। এই স্থানে অনেক ঋষি বা সাধক বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম ঋষিপত্তন হইয়াছিল। কালক্রমে ঋষিপত্তন নামটি জনসাধারণের নিকট অপরিচিত হয় এবং ঋষিপতন নাম প্রচলিত হয়। ঋষিপতন নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকাটী কল্পিত হয়।

ঋষিপত্তন হইতে ঋষিপতনের উৎপত্তি যেমন সম্ভব ঋষিপতন হইতে ঋষিপত্তনের উৎপত্তি সেইরূপ সম্ভব। স্থানের নাম জনসাধারণের মুখে প্রচলিত ছিল এবং জনসাধারণ প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিত।

শতাব্দের প্রথম ভাগে (৪০৫-৪১১) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ঋষিপতন নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এক জন প্রত্যেকবুদ্ধ এই বনে বাস করিতেন এবং ভগবান গৌতমবুদ্ধের মোক্ষলাভের সময় নিকটবর্ত্তী শুনিয়া এই স্থানে তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া পালি জাতক লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এবং মহাবস্তু অবদানে ঋষিপতনের অপর নাম মৃগদায় বা মৃগদাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গল্পটী লিখিত আছে। গৌতমবুদ্ধ এক সময়ে ৫০০ মৃগের দলপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এই বনখণ্ডে বিচরণ করিতেন। তখন তাঁহার নাম ছিল ন্যগ্রোধ। ন্যগ্রোধ দেখিতে অতি সুন্দর ছিল; তাহার ছিল সুবর্ণের মত স্নিগ্ধ কান্তি, মাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষু, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র শৃঙ্গ, সিন্দুরের মত লাল বর্ণ মুখ, অলক্তরাগে রঞ্জিত চারিখানি খুর, চামরের ন্যায় পুচ্ছ এবং অশ্বশাবকের ন্যায় বৃহৎ দেহ। ন্যগ্রোধের সহোদর বিশাখ অন্য এক যূথের অধিপতি হইয়া এই অরণ্যে বিচরণ করিত। তাহার আকৃতি বোধিসত্ত্বের (ন্যগ্রোধের) অনুরূপ ছিল। এই সময় কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত অনুচরবৃন্দ সহ প্রত্যহ এই বনখণ্ডে মৃগয়া করিতে আসিতেন এবং অনেক মৃগ বধ করিতেন। হরিণগুলি

তাহাদিগের এই বিপদের কথা ন্যগ্রোধের নিকট বলিল। ন্যগ্রোধ ও বিশাখ দুই ভ্রাতা রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট গিয়া নিবেদন করিল যে তিনি প্রত্যহ মৃগ শিকার করেন বলিয়া অনেক মৃগ আহত হইয়া কষ্ট পায়, কতক বা আতঙ্কে মরিয়া যায়। অতএব তাহারা প্রস্তাব করিল যে যদি রাজা আর ঐ বনে মৃগয়া করিতে না যান তবে তাহারা দুই দল হইতে পালা ক্রমে একটা করিয়া মৃগ প্রতিদিন রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালায় প্রেরণ করিবে। রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সেই দিন হইতে পালা ক্রমে একটা করিয়া মৃগ রাজার রন্ধনগৃহে যাইতে লাগিল।

একদিন বিশাখের দলের একটা হরিণীর পালা উপস্থিত হইল। হরিণী তাহার দলপতির নিকট গিয়া জানাইল যে সে গর্ভবতী। এখন সে পালা রক্ষা করিতে গেলে গর্ভস্থ শাবকও হত হইবে। শাবকটা প্রসূত হইয়া কিছু বড় হইলে তবে সে পালা রক্ষা করিতে যাইবে। অতএব এখন তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে পাঠান হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব মত বিশাখের যূথের কোন মৃগ যাইতে সম্মত না হওয়ায় হরিণী ভগ্নহৃদয়ে ন্যগ্রোধের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। ন্যগ্রোধ হরিণীকে অভয় দিয়া স্বয়ং রাজবাটীর রন্ধনশালায় গিয়া যূপকাষ্ঠে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত

পূর্ব্বেই ন্যগ্রোধকে অভয় দান করিয়াছিলেন, এখন তাহার আসিবার কারণ শুনিয়া ও তাহার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রতিদিন ন্যগ্রোধের বা বিশাখের যূথের একটা করিয়া হরিণ পাঠাইবার প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃগদিগকে 'দায়' অর্থাৎ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া, কিম্বা এই 'দাব' অরণ্য মধ্যে নিরাপদে বিচরণ করিতে দিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম মৃগদায় বা মৃগদাব হইয়াছিল। বর্ত্তমান সারনাথ (শারঙ্গনাথ) নামও এই উপাখ্যান স্মরণ করাইয়া দেয়। সারনাথের আধ মাইল ব্যবধানে শারঙ্গনাথ নামক শিবের মন্দির আছে।

বুদ্ধদেবের সারনাথে আগমন ও ধর্ম্ম প্রচার।

বুদ্ধদেব ঋষিপতনে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব্ব পাঁচটী সঙ্গী পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "ঐ শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। এখানে এই 'বাহুল্লিক' (যাহার বাহ্যাড়ম্বর বেশী) এবং 'প্রধান বিভ্ভান্তো' (বিভ্রান্ত) আসিলে আমরা প্রণাম বা অভ্যর্থনা করিব না; তবে যদি এখানে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ঐ আসনে বসিতে পারেন।" কিন্তু যখন বুদ্ধদেব নিকটবর্ত্তী হইলেন তখন ভিক্ষু পাঁচজন আর তাঁহাদিগের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলেন না, বুদ্ধদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন। একজন

তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ও উত্তরীয় লইলেন ; একজন তাঁহার বসিবার আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন ; তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন। বুদ্ধদেব আসন গ্রহণ করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিলে পর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নাম ধরিয়া ও বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বুদ্ধদেব এইরূপ সম্বোধন শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, তথাগত সম্পূর্ণ সম্বোধিলাভ করিয়াছেন ; আর তোমরা তথাগতকে নাম ধরিয়া এবং বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিও না ; তোমরা শুন, আমি অর্হৎ (জীবন-মুক্ত) হইয়াছি। আমি অমৃত লাভ করিয়াছি। আমি যে পথ তোমাদিগকে দেখাইব সে পথ যদি গ্রহণ কর তাহা হইলে ধর্ম্মজীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে।" তারপর বুদ্ধদেব তাঁহার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন নামক প্রথম সূত্র বিবৃত করিলেন।

বুদ্ধদেব বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিত ব্যক্তিগণ দুইটী চরম পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন ; একটী ভোগ বিলাসের পথ অপরটী কঠোর তপস্যার পথ। কিন্তু এই দুয়ের কোন একটী পন্থা অবলম্বন করিলে নির্ব্বাণ বা মোক্ষলাভ করা যায় না। অতএব এই দুইটী পথই পরিত্যজ্য। এই দুইটী পথ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যমা প্রতিপদা বা মধ্যপথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সেই মধ্য

পথটা কি ? এই 'আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' সেই মধ্য পথ। যথা—সম্মা দিট্ঠি—সম্যক্ দৃষ্টি : সম্মা সংকপ্পো—সম্যক্ সংকল্প : সম্মা বাচা—সম্যক্ বাক্য ; সম্মা কম্মান্তো—সম্যক্ কর্ম্মান্ত ; সম্মা আজিবো—সম্যক্ আজীব ; সম্মা বায়ামো—সম্যক্ ব্যায়াম ; সম্মা সতি—সম্যক্ স্মৃতি ; সম্মা সমাধি—সম্যক সমাধি। হে ভিক্ষুগণ, এই চারিটী আর্য্য সত্য। দুঃখ আর্য্য সত্য ; দুঃখ সমুদয় (দুঃখের কারণ) আর্য্য সত্য ; দুঃখ নিরোধ আর্য্য সত্য ; দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা আর্য্য সত্য। দুঃখ কাহাকে বলে ? জাতি পি দুক্খা—জন্ম দুঃখকর, জরা পি দুক্খা—জরা দুঃখকর, ব্যাধি পি দুক্খা—ব্যাধি দুঃখকর, মরণম্ পি দুক্খম্—মরণ দুঃখকর, অপ্পিয়েহি সম্পযোগো দুক্খো—অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ দুঃখকর, পিয়েহি বিপ্পযোগো দুকখো—প্রিয় বস্তুর বিয়োগ দুঃখকর, ইয়ম্ পিয়ম ন লভতি তম পি দুক্খম্—আকাঙ্খিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখকর। দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের উৎপত্তি হয় কোথা হইতে ? তৃষ্ণা বা বাসনা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। দুঃখ নিরোধ হয় কি প্রকারে ? তৃষ্ণা বা বাসনার নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিরোধ হয়। দুঃখের নিরোধের পথ কি ? হে ভিক্ষুগণ, এই আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ দুঃখ নিরোধের পথ। যথা : সম্যক্ দৃষ্টি—বিশুদ্ধ মত গ্রহণ ; সম্যক্ সঙ্কল্প—উচিত কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ;

সম্যক বাক্য—সত্য কথা বলা ; সম্যক্ কর্ম্মান্ত—উচিত কাজ করা ; সম্যগাজীব—সৎ পথে চলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ; সম্যক্ ব্যায়াম—উচিত চেষ্টা ; সম্যক্ স্মৃতি —সৎকথা স্মরণ করা ; সম্যক্ সমাধি—সত্যের ধ্যান।"

বৌদ্ধ তীর্থরূপে সারনাথ।

পৃথিবীতে যত প্রকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই কতিপয় বাক্যকে বুদ্ধদেবের প্রথম উপদেশ বাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কয়েকটী বাক্যে নিবদ্ধ উপদেশই বৌদ্ধধর্ম্মের সারকথা। এই উপদেশ বাক্যনিচয় ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন সূত্র নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এই সকল উপদেশ বাক্য প্রচার করিয়া ভগবান গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে নূতন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। বারাণসীর উপকণ্ঠে মৃগদাব ঋষিপত্তনে বুদ্ধদেব এই কয়েকটী মহাবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই এই স্থানের এত মহিমা। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে কথিত আছে যে বুদ্ধদেব ইহলোক ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তদীয় প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়া যান যে বুদ্ধভক্তেরা চারিটী পবিত্র স্থান পরিদর্শন করিবেন। জন্মস্থান—কপিলবস্তুর লুম্বিনী নামক উদ্যান ; সম্বোধি বা সিদ্ধিলাভের স্থান—গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব (পালি উরুবেলা) গ্রামের (বর্ত্তমান বুদ্ধগয়া) বোধিবৃক্ষ ;

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান—মৃগদাব বা ঋষিপতন (সারনাথ); মহাপরিনির্ব্বাণের স্থান—মল্লদিগের রাজধানী কুশীনগর (বর্ত্তমান গোরখপুর জেলার অন্তর্গত কাশিয়া)।) তদবধি এই সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া এই তীর্থচতুষ্টয়ের অন্যতম সারনাথ বুদ্ধভক্তজনের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

মৌর্য্য যুগের নিদর্শন — অশোক স্তম্ভ।

বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পর হইতে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঋষিপত্তনের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সময়ে নিশ্চয়ই এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রাচীন সঙ্ঘারামের কোনও চিহ্ন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই প্রায় সার্দ্ধ সহস্র বৎসরের সারনাথের ইতিহাস প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ধ্বংসাবশেষ এবং ভগ্নস্তূপ অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অশোকের সময়ের তিনটী কীর্ত্তির নিদর্শন এখনও সারনাথে বিদ্যমান— অশোকের অনুশাসন যুক্ত স্তম্ভ বা লাট, ইষ্টক নির্ম্মিত ধর্ম্মরাজিকার (স্তূপের) ভিত্তি এবং একটী প্রস্তর বেদিকার (railing) ভগ্নাংশ। বৌদ্ধসঙ্ঘে দলাদলি নিবারণের নিমিত্ত মহারাজ অশোক অনুশাসন সহ উক্তস্তম্ভ আনুমানিক ২৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভটী ভগ্নাবস্থায় প্রাপ্ত

হইলেও ইহার উপরিভাগে উৎকীর্ণ অনুশাসনখানি প্রায় সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ধর্ম্মরাজিকা স্তুপ।

সারনাথে অশোকের দ্বিতীয় কীর্ত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত স্তুপ১। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহের ভস্ম আট ভাগ করা হইয়াছিল এবং রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকপ্প, রামগ্রাম, বেঠদীপ, পাবা ও কুশী নগর এই আটটি স্থানে তাহা প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক একটি স্তুপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। প্রবাদ আছে সম্রাট অশোক রামগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য স্থানের স্তুপগুলি খনন করিয়া এবং ঐ সকল স্তুপে প্রোথিত বুদ্ধদেবের দেহের ভস্মাবশেষ ৮৪,০০০ ভাগে বিভক্ত করিয়া ৮৪,০০০ ধর্ম্মরাজিকা বা স্তুপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অশোক স্তম্ভের দক্ষিণে আবিষ্কৃত যে ইষ্টক নির্ম্মিত স্তুপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আদৌ

(১) স্তুপ ইষ্টক বা প্রস্তরে নিরেট ভাবে নির্ম্মিত হইত। ইহা কোন সাধু বা বড়লোকের দেহাবশেষ রক্ষা করিবার জন্য, কোন স্মরণীয় ঘটনা লোকের মনে জাগাইয়া রাখিবার জন্য, অথবা কোনও মহৎ ব্যক্তির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইত। এই জাতীয় স্তুপ বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই নির্ম্মাণ করিত। কোনও কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে কেবল বুদ্ধ বা চক্রবর্ত্তীদিগের ভস্মাবশেষই স্তুপে সমাহিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইত, কিন্তু সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং আচার্য্যগণও এই সম্মান পাইতেন।

রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে তাহার আয়তন অনেকটা বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীর রাজার দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ এই স্তূপটা বিধ্বস্ত করিয়া ইহার উপাদান লইয়া কাশীতে জগৎগঞ্জ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষকে 'জগৎসিংহ স্তূপ' বলিতেন। রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী কৃত সারনাথ বিবরণের তৃতীয় সংস্করণে এই স্তূপকে 'ধৰ্ম্ম-রাজিকা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অশোক নির্ম্মিত বেদিকা।

অশোকের তৃতীয় কীর্ত্তি একটা প্রস্তর বেদিকা (railing) বা প্রাচার। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে কাশীর ইঞ্জিনিয়ার ওরটেল (Oertel) সাহেব সারনাথের প্রধান মন্দিরের (main shrine) দক্ষিণ কক্ষের ভিত্তি খনন করিতে গিয়া ইহা আবিষ্কার করেন। রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী অনুমান করেন যে এই বেদিকা অশোকনির্ম্মিত স্তূপের উপরিভাগের হর্ম্মিকায় নিবদ্ধ ছিল।

শুঙ্গ যুগের নিদর্শন।

আনুমানিক ২৩১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অশোকের দেহাবসানের অনতিকাল পরেই মৌর্য্যসাম্রাজ্যের গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছিল। ধৰ্ম্ম প্রচার করাই সম্রাট অশোকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় মৌর্য্য সাম্রাজ্যের

রাষ্ট্রীয় বন্ধন দৃঢ়তর করিবার তিনি অবকাশ পান নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে গান্ধার, কপিশা, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। আনুমানিক ১৮৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে 'সেনা-পতি' পুষ্যমিত্র তাঁহার প্রভু মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিয়া সারনাথে শুঙ্গ সম্রাটদিগের কোন খোদিত লিপি পাওয়া যায় নাই, কেবল ঐ সময়কার প্রস্তর বেদিকার কয়েকটা স্তম্ভ প্রধান মন্দির ও অশোক স্তম্ভের চারিদিকে পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভগুলিতে ব্রাহ্মী অক্ষরে দাতৃগণের নাম উৎকীর্ণ আছে। ঐ সময়কার একটী স্তম্ভশীর্ষ প্রধান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত মন্দির খননকালে একটা প্রস্তর নির্ম্মিত শুঙ্গ যুগের নরমুণ্ডের ভগ্নাংশ [বি১] আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধগয়া, ভারহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানের কাত্তি চিহ্ন দেখিলে মনে হয় যে শুঙ্গ রাজগণ বৌদ্ধ না হইলেও তৎকালে জনসাধারণের বৌদ্ধ ধর্ম্মে অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। শুঙ্গ বংশীয় শেষ রাজা দেবভূমি বা দেবভূতি

অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন এবং এই নিমিত্ত তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব আনুমানিক ৭২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই রূপে শুঙ্গ বংশের পতন হয়। তৎপরবর্ত্তী যুগের প্রাচ্য ভারতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

কুষাণ যুগের নিদর্শন-বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, ছত্র ও দণ্ড।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনুমানিক ৬০ খৃঃ) ইয়ুচি বংশোদ্ভব কুষাণগণ পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। যিনি এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম কুজুল কদফিস (Kujula Kadphises)। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিম কদফিস (Vima Kadphises) বোধ হয় বারাণসী পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১২৫ খৃষ্টাব্দে কুষাণবংশীয় কণিষ্ক রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিষেকের দিন হইতে শকাব্দ গণিত হইতেছে। কণিষ্ক চীনের সীমান্ত পর্য্যন্ত কুষাণ সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। প্রথমে কণিষ্ক জোরোয়াষ্ট্রীয় (Zoroastrian) দেবতাগণের উপাসনা করিতেন, কিন্তু পরে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই সময়ে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কণিষ্কের রাজত্ব

কালে নানা স্থানে বৌদ্ধ মন্দির ও স্তূপাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারনাথে কণিষ্কের সময়ে একটা বৃহৎ বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি (চিত্র ৭) এবং প্রকাণ্ড ছত্র ও দণ্ড [বি (এ) ১] পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে ও পশ্চাতে এবং ইহার ছত্রের দণ্ডে যে তিনটা লিপি খোদিত আছে তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বারাণসীতে বুদ্ধদেবের পাদচারণ স্থানে ত্রিপিটকবিদ্ ভিক্ষু বল একটা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি এবং ছত্র ও যষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই খোদিত লিপিতে মহাক্ষত্রপ (Great Satrap) খরপল্লান এবং ক্ষত্রপ (Satrap) বনস্পরের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে সারনাথ ও বারাণসী তখন কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মহাক্ষত্রপ খরপল্লান তৎপ্রদেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কুষাণযুগের আর একটা নিদর্শন, প্রধান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত স্তূপের নিকট আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি। ইহাতে বৌদ্ধদিগের আর্য্যসত্য চতুষ্টয়ের কথা লিখিত আছে [ডি (সি) ১১]।

মহারাজ কণিষ্কের পরে বাসিষ্ক ও বাসিষ্কের পরে হুবিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বাসুদেব কুষাণ সিংহাসনে

আরোহণ করিয়াছিলেন। মথুরা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোনও স্থানে হুবিষ্কের এবং বাসুদেবের সময়ের খোদিত লিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের সহিত বারাণসীর তখন কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

গুপ্ত যুগে সারনাথ।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর বারাণসীর ইতিহাস একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিচ্ছবি রাজ-বংশের জামাতা চন্দ্রগুপ্ত মগধে একটা নূতন রাজ্য স্থাপনের সূচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পিতা ঘটোৎকচ গুপ্ত সম্ভবতঃ সামান্য সামন্ত নরপতি ছিলেন। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক কাল হইতে 'গুপ্তাব্দ' নামে একটা নূতন অব্দ প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৩৩৫ খৃষ্টাব্দে) লিচ্ছবি রাজবংশের দৌহিত্র ও চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উত্তর এবং পূর্ব্ব ভারতে গুপ্ত প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। আনুমানিক ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দেহাবসানের পর তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া

বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ঋষিপতনের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গুপ্ত যুগের নিদর্শন—কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তের রাজ্যকালের বুদ্ধমূর্ত্তি।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন লিপি বা মুদ্রা সারনাথে পাওয়া যায় নাই, তবে কাশী যে সে সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। ৪১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর প্রথম কুমারগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন এবং ৪৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সারনাথে ধর্ম্মরাজিকা (জগৎসিংহ) স্তূপের দক্ষিণে আবিষ্কৃত একটী বুদ্ধমূর্ত্তির [বি(বি):৭৩] নিম্নদেশে "দে (য়) ধর্ম্মোহয়ং কুমারগুপ্তস্য" লিপি উৎকীর্ণ থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে বোধ হয় ইহা রাজা কুমারগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কুমারগুপ্তের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের সময় পুষামিত্রীয় ও হূণগণ আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিলে তিনি প্রথম বারে আক্রমণকারিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে হূণগণ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছিল এবং কপিশা ও গান্ধার

অধিকার করিয়া একটী নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে ৪৬৭-৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৪৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে নরসিংহগুপ্ত পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীবস্ (Hargreaves) সাহেব সারনাথে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে (pedestal) একটী লিপি উৎকীর্ণ আছে[১]। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৫৪ গুপ্ত সম্বতে (৪৭৩-৪৭৪ খৃঃ) কুমারগুপ্তের শাসনকালে ভিক্ষু অভয়মিত্র কর্ত্তৃক এই বুদ্ধ মূর্ত্তিটী প্রতি-

(১) পংক্তি ১—বর্ষশতে গুপ্তানাং সচতুঃ পঞ্চাশদুত্তরে ভূমিং রক্ষতি কুমার
গুপ্তে মাসে জ্যৈষ্ঠে দ্বিতীয়ায়াম্ ॥

„ ২—ভক্তাবর্জ্জিত মনসা যতিনা পূজার্থমভয়মিত্রেণ প্রতিমা-
প্রতিমস্য গুণৈ [র্] প [রে] যং ' কা_ রিতা শাস্তুঃ।

„ ৩—মাতাপিতৃগুরু পূর্ত্তিঃ পুণ্যেনানেন সত্বকায়োয়ং লভতা-
মভিমতমুপশম হ ... ... য়াম্ ॥

A. S. R., Part II, 1914-15, page 124.

ষ্ঠিত হইয়াছিল। হারগ্রীবস্ সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আর একটী বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠে একটী খোদিত লিপিতে[১] লিখিত আছে যে ১৫৭ সম্বতের বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথিতে মূলা নক্ষত্রে বুধগুপ্তের শাসন কালে ভিক্ষু অভয়মিত্র কর্ত্তৃক এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বুধগুপ্তের শাসনকালে কাশীজনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সারনাথ—মৌখরী বর্দ্ধন বংশেররাজ্যকাল—হুয়েঙসাঙের সারনাথ বর্ণন।

মালবদেশের অন্তর্গত মন্দশোর নগরের সন্নিধানে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত প্রশস্তি পাঠে অনুমান হয় যে ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যশোধর্ম্ম হূনাধিপ মিহির কুলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই অথবা প্রায় এই সময়ে বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশে মৌখরী বংশের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বার-বাঁকী জেলার অন্তর্গত হাড়াহা নামক গ্রামের নিকট প্রাপ্ত একখানি খোদিত শিলাফলক হইতে অবগত হওয়া

(১) গুপ্তানাং সমতিক্রান্তে সপ্তপঞ্চাশদুত্তরে। শতে সমানাং পৃথিবীং বুদ্ধগুপ্তে প্রশাসতি॥ বৈশাখমাসসপ্তম্যাং মূলে শ্যামগতে ময়া। কারিতা ভয়মিত্রেণ প্রতিমা শাক্যভিক্ষুণা॥ ইমামুদ্ধস্তসচ্ছত্র পদ্মাসনবিভুষিতাং। দেব পুত্রবতো দিব্যাং চিত্রবিদা সচিত্রিতাং॥ যদত্র পুণ্যং প্রতিমাং কারয়িত্বা ময়া ভূতম। মাতাপিত্রোর্গুরূণাংচ লোকস্য চ শমাপ্তয়ে॥

Ibid, p. 125.

যায়, ৬১১ বিক্রম সম্বতে (৫৫৪ খৃঃ) মৌখরীরাজ ঈশান বর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই লিপিতে কথিত হইয়াছে যে ঈশানবর্ম্মা অন্ধ্রপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশী মৌখরীরাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ঈশানবর্ম্মণের পরে যথাক্রমে শর্ব্ববর্ম্মা এবং অবন্তীবর্ম্মা মৌখরী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মৌখরী অবন্তীবর্ম্মণের পুত্র এবং হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নীপতি গ্রহবর্ম্মণকে কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। আনুমানিক ৬০৫ খৃষ্টাব্দে গ্রহবর্ম্মা মালবরাজ দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধন গ্রহবর্ম্মার পত্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিবার মানসে কান্যকুব্জে আগমন করিলে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তদীয় অনুজ হর্ষবর্দ্ধন স্থানীশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে, ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েঙ্‌সঙ্ ভারতভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছিলেন। হুয়েঙ্‌সঙ্ লিখিয়াছেন যে রাজ্যলাভের পর ছয় বৎসরের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত (পঞ্চ গৌড়) স্বীয় পদানত করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজধানী স্থানীশ্বর (থানেশ্বর) হইতে কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। হুয়েঙ্‌সঙ্ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই সময়কার সারনাথের অতি সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বারাণসীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত শতফিট উচ্চ অশোক নির্ম্মিত একটী স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েঙ্‌সঙ্ লিখিয়াছেন, এই স্তূপের সম্মুখে সবুজ প্রস্তরের অতি মসৃণগাত্র একটী স্তম্ভ ছিল। এই স্তম্ভের কোনও চিহ্ন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। তৎকালের মৃগদাব বা সারনাথ সম্বন্ধে হুয়েঙ্‌সঙ্ লিখিয়াছেন, এই স্থানের সুবিশাল সঙ্ঘারাম তখন আট ভাগে বিভক্ত ছিল এবং সমুদয় সঙ্ঘারাম একটী প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই সঙ্ঘারামে তখন হীনযান সম্মতীয় সম্প্রদায়ের ১৫০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে দুই শত ফিটেরও অধিক উচ্চ চমৎকার কারুকার্য্যমণ্ডিত একটী মন্দির ছিল। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে ধাতুনির্ম্মিত মানুষপ্রমাণ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনরত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। হুয়েঙ্‌সঙ্ এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত অশোকের নির্ম্মিত শতফিট উচ্চ ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই স্তূপের সম্মুখভাগে তখন ৭০ ফিট উচ্চ অতি মসৃণগাত্র পাষাণ স্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল বলা বাহুল্য এই স্তম্ভেরই ভগ্নাংশের উপর অশোকের

অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে এবং এই স্তম্ভের শীর্ষদেশ চারিটী সিংহমূর্ত্তিমণ্ডিত ছিল। হুয়েঙ্‌সঙ্‌ লিখিয়াছেন, "সম্বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব যে স্থানে (বসিয়া) প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই স্থানে এই স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" হুয়েঙ্‌সঙ্‌ মৃগদাবের অপরাপর অংশেরও বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না[১]। হুয়েঙ্‌সঙের সময়ে কাশী প্রদেশ অবশ্য হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠিত কান্যকুব্জের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল এবং এই অবধি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত সারনাথের ভাগ্যলক্ষ্মী কান্যকুব্জেশ্বরের ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসারিণী ছিলেন।

কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা, আযুধ ও প্রতীহার রাজবংশ।

৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর আর্য্যবর্ত্তের ইতিহাসে আর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সূচনা হয়। তারপর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কান্যকুব্জের সিংহাসনে যশোবর্ম্মা নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতিকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। যশোবর্ম্মা এক সময়ে মগধ ও বঙ্গ পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত এবং

(১) S. Beal, *Buddhist Records of the Western World*, London, 1906, Vol II, pp. 45-60, Watters *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol. II, pp. 48-5৫

সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আয়ুধবংশীয় নৃপতিগণ কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অনুগত চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে রাজপুতানার অন্তর্গত ভিল্লমালের প্রতীহার, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মালখেড়ের রাষ্ট্রকূট এবং গৌড়ের পাল এই তিন বংশের নৃপতিগণকে আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌমত্ব লইয়া বিরোধে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতীহার বংশীয় মিহির-ভোজ (আদিবরাহ) স্থায়িভাবে কান্যকুব্জ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সারনাথে প্রতীহার রাজগণের বা তাঁহাদের নাম যুক্ত কোনও কীর্ত্তিচিহ্ন এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।

পালরাজগণের নিদর্শন—মহীপালের কীর্ত্তি: ১০২৫ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি।

সারনাথের প্রাপ্ত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রচলিত অক্ষরে খোদিত একখানি শিলালিপিতে[১] [ডি(এফ)৫৯]

---

(১) বিগ্রপালঃ॥ দশ চৈত্তাংস্তু যৎ পুণ্যং কারয়িত্বার্জ্জিতং ময়া সর্ব্বলোকো ভবেৎতেন সর্ব্বজ্ঞঃ করুণাময়ঃ॥ শ্রীজয়পাল ... ... এতান্ বৃদ্ধিশ্য কারিতমামৃতপালে [ন]।

দাতারূপে শ্রীজয়পালের নাম দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই জয়পাল গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্পুত্র। সারনাথে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের একখানি বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ ১০৮৩ বিক্রম সম্বতের (১০২৫ খৃষ্টাব্দের) একখানি লিপি [বি(সি)১] হইতে জানা যায় গৌড়াধিপ মহীপাল, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের দ্বারা কাশীধামে ঈশানের (শিবের) ও চিত্রঘণ্টার (দুর্গার) মন্দির এবং আরও শত শত কীর্ত্তি রত্ন প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। স্থিরপাল এবং বসন্তপাল সারনাথে ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ এবং বিহার ও মন্দিরাদি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং একখানি শিলাফলকে আটটী মহাস্থানে সংঘটিত গৌতম বুদ্ধের জীবনের আটটী প্রধান ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করাইয়া তাহা একটী নবনির্ম্মিত গন্ধকুটীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন[১]।

---

(১) ১। ওঁ নমো বুদ্ধায॥ বারান(ণ)শী(সী)-সরস্যা' গুরব শ্রীবামরাশি পাদাজং।

আরাধ্য নমিত-ভুপতি-শিরোরুহৈঃ শৈবকাধীশং॥

ই (ঈ)শান-চিত্রঘণ্টাদি-কীর্ত্তি রত্নশতানি যৌ।

গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকার য়ৎ॥

২। সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।

তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবম॥

কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থান শৈল-গন্ধকুটীং।

এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান॥

৩। সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১ [॥]

Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath, p 8.

কলচুরি রাজ কর্ণদেবের ১০৫৮ খৃষ্টাব্দের শিলা-লিপি।

১০১৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া সেই মহানগর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই সময় কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রতীহারবংশীয় রাজ্যপাল। মামুদ কর্তৃক কান্যকুব্জ ধ্বংসের পরেই প্রতীহার বংশ না হউক প্রতীহার রাজ্য কার্য্যতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং প্রাচ্য ভারতের আধিপত্য লইয়া গৌড়াধিপ মহীপাল এবং ত্রিপুরিরাজ কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সূত্রে কাশী প্রদেশ বোধ হয় এক সময় পাল নরপালের পদানত হইয়াছিল। ধামেক স্তূপের উত্তর দিকে ছয় খণ্ডে বিভক্ত একখানি লিপিযুক্ত শিলাফলক [ডি (এল)৮] আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফলকের লিপিতে কথিত হইয়াছে, ১০৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে কলচুরি বংশীয় (গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র) পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কর্ণদেবের কল্যাণবিজয় রাজ্যকালে উপাসিকা মামকা একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহা এবং অন্যান্য দ্রব্য ভিক্ষুগণকে দান করাইয়াছিলেন[১]। এই লিপি পাঠে অনুমান হয় ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে সারনাথ কলচুরি রাজ্যের অন্তর্ভূ'ত ছিল।

(১) মূল লিপির পাঠ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

গাহড়বাল রাজত্বে সারনাথ; কুমরদেবী প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার; মুসলমান আক্রমণ ও লুণ্ঠন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গাহড়বাল বংশীয় চন্দ্রদেব কান্যকুব্জে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই রাজ্য শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং কাশী প্রদেশ বরাবর এই রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সারনাথে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি [ডি (এল) ৯] হইতে জানা যায় চন্দ্রদেবের পৌত্র গাহড়বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী কুমরদেবী সারনাথে একটী বিহার প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন[১]। এতদ্ভিন্ন আর কোন গাহড়বাল কীর্ত্তি সারনাথে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চ্চন্দ্র সুলতান মৈজুদ্দীন মহম্মদ ইবন্ সাম কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসী মুসলমান সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক্ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে সম্ভবতঃ সারনাথের অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তিও বিনষ্ট হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে সারনাথের উপর যে যবনিকা পতিত হয় তাহা প্রথম উত্তোলিত হয় ঠিক ছয় শত বৎসর পরে, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে, যখন জগৎ সিংহের লোকেরা সারনাথ ধ্বংসের শেষ অঙ্কের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

জগৎ সিংহের খনন।

রাজা চেৎসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ নিজের নামে

(১) মূল লিপির পাঠ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

একটী বাজার নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সারনাথের স্তূপ ভাঙ্গিয়া ইষ্টক ও প্রস্তর আহরণে লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকগুলি খনন করিতে করিতে একটী স্তূপের মধ্যে একটি প্রস্তরের আধার প্রাপ্ত হয়। এই প্রস্তরাধারের মধ্যে একটী মর্ম্মর নির্ম্মিত ছোট কৌটা (relic casket) পাওয়া গিয়াছিল। এই বৃহৎ প্রস্তর আধারটী প্রায় ৪০ বৎসর পরে কলিকাতা মিউজিয়মে লইয়া যাওয়া হয়। এই খননের বিস্তারিত বিবরণ বারাণসীর কমিশনর জোনাথন ডানক্যান (Mr. Jonathan Duncan) সাহেব এশিয়াটিক্ সোসাইটী অব্ বেঙ্গলের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই স্থানে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইহার পাদপীঠে পাল নরপতি মহীপালের লিপি উৎকীর্ণ আছে।

মেকেঞ্জীর খনন।

পুরাতত্ত্ব উদ্ধার কল্পে সারনাথের প্রথম খনন কার্য্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মেকেঞ্জী (Colonel A. Mackenzie) সাহেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি এখন কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ কর্ণেল মেকেঞ্জী সাহেবের খননের কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই।

কানিংহামের খনন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত জেনারল সার এলেক-

জাণ্ডার কানিংহাম্ (General Sir Alexander Cunningham) নিজ ব্যয়ে দুইটী স্তূপ, একটী সঙ্ঘারাম এবং ধর্ম্মরাজিকা (জগৎসিংহ) স্তূপের উত্তর দিকের একটী মন্দির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ধামেক ও চৌখণ্ডী স্তূপ দুইটী খননের বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। উপরোক্ত ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের প্রস্তর আধারটী তিনি খুজিয়া বাহির করেন এবং অনেকগুলি মূর্ত্তি এই স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে প্রদান করেন। তিনি আনুমানিক চল্লিশটী মূর্ত্তি এবং বহুসংখ্যক খোদিত প্রস্তর সারনাথে ফেলিয়া যান। পাদ্রি শেরিঙের (Rev. M. A. Sherring) পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বরুণা নদীর সেতু (Duncan Bridge) নির্ম্মাণের সময় সারনাথের আটচল্লিশটী মূর্ত্তি এবং অন্যবিধ প্রস্তর ফলকাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সারনাথের প্রাচীন ইমারত হইতে পঞ্চাশ গাড়ীর অধিক পাথর বরুণার লৌহ সেতু নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কিটোর খনন।

এই ঘটনার পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মেজর কিটো (Major Markhan Kittoe) এস্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি ঐ সময়ে কুইন্স কলেজ (Queen's College) ভবন নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার খননের ফলে ধামেক স্তূপের চারিপার্শ্বে বহুসংখ্যক

ইমারতের অংশ বাহির হইয়াছিল। একটী ইমারতকে তিনি রোগিনিবাস (hospital) বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু এখন জানা গিয়াছে যে এটি একটী সঙ্ঘারাম মাত্র। মেজর কিটো আর একটি সঙ্ঘারামের পরিষ্করণ আরম্ভ করেন। এটি এক্ষণে কিটোর সঙ্ঘারাম নামে অভিহিত হয়। তিনিও কলেজ নির্ম্মাণে সারনাথের প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

টমাস ও হলের খনন।

ইহার পর টমাস (Mr. E. Thomas, C. S.) সাহেব এবং প্রফেসার হল (Professor Fitz Edward Hall) সাহেব খনন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। কার্ণক (Mr. A. Rivett Carnac) সাহেব ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই ঘটনার পূর্ব্বে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট একজন নীলকর ফার্গুসন (Mr. Fergusson) সাহেবের নিকট হইতে সারনাথের জমী ক্রয় করেন।

ওর্‌টেলের খনন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার ওরটেল (Mr. F. O. Oertel) সাহেব গাজীপুর পথ হইতে সারনাথে যাইবার জন্য একটা রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। এই পথ নির্ম্মাণ কালে তিনি একটা বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং প্রত্নতত্ত্ব-

বিভাগের সাহায্যে সারনাথের খনন কার্য্য নূতন উদ্যমে আরম্ভ করেন। ওরটেল সাহেবের খননের ফলে প্রধান মন্দির, অশোক স্তম্ভ ও তাহার সিংহচূড়া, অনেকগুলি মূর্ত্তি ও খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই খননের বিস্তারিত বিবরণ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন।

ইহার দুই বৎসর পরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ সার জন্ মার্শেল (Sir John Marshall, Director General of Archaeology in India), ডাক্তার কোনো (Dr. Sten Konow), নিকোল্‌স্ (Mr. W. H. Nicholls) সাহেব এবং রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনীর সহায়তায় সারনাথের উত্তরভাগ এবং প্রধান মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। এই খননের ফলেই সর্ব্ব প্রথম সারনাথের প্রাচীন মঠ, মন্দিরাদির সংস্থান নির্ণীত হয়। প্রধান মন্দির, অশোক স্তূপ এবং অশোক স্তম্ভকে কেন্দ্র করিয়া যে সারনাথে অন্যান্য ইমারতাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহাও এই খনন হইতেই অবগত হওয়া যায়। সার জন মার্শেল সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ইমারতগুলির মধ্যে কুষাণ যুগের তিনটী সঙ্ঘারাম এবং তাহাদের ধ্বংসাবশের উপর মধ্যযুগে নির্ম্মিত সুবৃহৎ বিহার এই চারিটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত খননে প্রাপ্ত মূর্ত্তি, শিলালিপি, মৃত্তিকার পাত্রাদি সারনাথ মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। সার জন মার্শেল উপর্য্যুপরি দুই বৎসর এইস্থানের খনন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে সারনাথ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের একটী কেন্দ্র ছিল। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ হারগ্রীবস (Mr. H. Hargreaves) সাহেব প্রধান মন্দিরের পূর্ব্ব, উত্তর এবং পশ্চিম দিকে খনন কার্য্য পরিচালিত করেন। শেষোক্ত স্থানে একটী প্রাচীন মন্দির এবং শুঙ্গযুগের বহুসংখ্যক মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তিনটী দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি এই স্থানে আবিষ্কৃত হয়। তাহাদের উপরে খোদিত লিপি হইতে গুপ্তদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায় (পৃঃ ২৪-২৫)।

গত ছয় বৎসর যাবৎ সারনাথের খনন কার্য্য এবং গৃহ নিদর্শনাদির সংরক্ষণ রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহনীর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। নূতন খনন কার্য্যের মধ্যে ধামেক স্তূপ এবং প্রধান মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জমি ও দুই সংখ্যক সঙ্ঘারামের পরীক্ষা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রথম স্থানটীতে প্রাচীন কালে একটী পুষ্করিণী ছিল এই বিশ্বাসানুসারে

উহা ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ভরিয়া দেওয়া হয়। সেই স্থানের খননের ফলে একটী বৃহৎ উন্মুক্ত অঙ্গণ (পরিমাণ ২৭১′ × ১১২′) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঙ্গণটী নিশ্চয়ই অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে প্রধান মন্দিরের সহিত সংযুক্ত ছিল। যে পয়ঃপ্রণালী দিয়া প্রধান মন্দির এবং এই অঙ্গণ হইতে জল নিঃসৃত হইত সেটাও পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দের আংশিকরূপে উদ্ধৃত দ্বিতীয় সঙ্ঘারামের পুনর্ব্বার খননের ফলে একটী মন্দির এবং তৎসহিত একটী দীর্ঘ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধ্বংসাবশেষ।

চৌখণ্ডী স্তূপ।

বারাণসী হইতে গাজীপুর যাইবার প্রশস্ত রাজপথের একটী শাখা সারনাথ অভিমুখে গিয়াছে। এই রাস্তায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বামপার্শ্বে একটী উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত স্তূপ দর্শকের নয়নপথে পতিত হয় (চিত্র ২)। এই স্তূপটী চৌখণ্ডী নামে বিখ্যাত। ইহার উপরে একটী অষ্টকোণি বুরুজ আছে। এই বুরুজের উত্তর দ্বারের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখানি প্রস্তর ফলকে পারস্য ভাষায় এই লিপিটী উৎকীর্ণ রহিয়াছে :—

الله اكبر

چو اینجا شاه جنت آشیانی
همایون بادشاه هفت کشور
بروزے آمد و بر تخت بنشست
وزان شد مطلع خورشید انور
کمینه بنده را آمد بخاطر
غلام خانه زاد شاه اکبر
که سازد جائے نو برسر آن
معلا گنبدے چون چرخ اخضر
نود نهش سال و نهصد بود تاریخ
که آمد در بنا این خوب منظر

"সপ্তমহাদেশের সম্রাট স্বর্গবাসী হুমায়ূন একদিন এই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিয়া সূর্য্যের জ্যোতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তদীয় পুত্র এবং দীন ভৃত্য আকবর গগনস্পর্শী একটী উচ্চ বুরুজ নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। ৯৯৬ হিজিরীতে [১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে] এই বুরুজটা নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

এই বুরুজের উপর হইতে দক্ষিণ দিকে কাশীর বেণী-মাধবের ধ্বজা এবং উত্তর দিকে ধামেক স্তূপ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের দৃশ্য নয়নগোচর হয়।

১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্ত্তৃক এই স্তূপের নিম্নাংশ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। স্তূপটা তিনটী চতুষ্কোণ পীঠিকার উপর অবস্থিত। প্রত্যেক পীঠিকা প্রস্থে এবং উচ্চতায় প্রায় দ্বাদশ ফিট। এই স্তূপটা এখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অষ্টকোণবিশিষ্ট তারকাকৃতি ভিত্তির (plinth) কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান। স্তূপের সকল পীঠিকার গাত্রে সারিসারি প্রকোষ্ঠ বাহির হইয়াছে। এই স্থান খননের ফলে ওরটেল সাহেব কাল্পনিক সিংহমূর্ত্তি (leogryph) পরিশোভিত দুইখানি প্রস্তর-খণ্ড [সি (বি) ১ ও ২] প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক সিংহের উপরে ও নিম্নে দুইজন যোদ্ধা অবস্থিত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারল কানিংহাম স্তূপের উপরি-ভাগের বুরুজের মেঝে হইতে স্তূপের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত

একটী গভীর কূপ খনন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই পান নাই। তাঁহার অনুমান গৌতমবুদ্ধ গয়া হইতে মৃগদাবে আসিবার সময় কৌণ্ডিন্যাদি সন্ন্যাসীদিগের সহিত এই স্থানে মিলিত হন। এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্তূপটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কানিংহাম সাহেবের অনুমানের সহিত হুয়েঙ্‌সঙের বর্ণনার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। হুয়েঙ্‌সঙ্ বলেন এই স্তূপটী উচ্চতায় ৩০০ ফিট ছিল কিন্তু ওরটেল সাহেবের অনুমান ২০০ ফিট। বর্ত্তমান কালে ইষ্টকচূড়া সহ ইহার উচ্চতা ৮৪ ফিটের অধিক হইবে না।

স্তূপের পার্শ্বের পতাকা শোভিত ইটের চাতালটী আধুনিক। এখানে গ্রামের লোক ভূত প্রেত শান্তির জন্য ছাগ বলি দিয়া থাকে।

মৃগদাব।

এখান হইতে আরও অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অগ্রসর হইলে দর্শক মৃগদাবে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং দক্ষিণ পার্শ্বে মিউজিয়ম গৃহ দেখিতে পাইবেন। মিউজিয়ম দেখিবার পূর্ব্বে দর্শকের সারনাথের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করা উচিত। দর্শকের সুবিধার জন্য এক নম্বর চিত্রে সারনাথের ধ্বংসাবশেষ অভিমুখে যাইবার পথটী লাল রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সারনাথের দক্ষিণ ভাগ

সারনাথের খনিত অংশ দুই ভাগে বিভক্ত: (১) দক্ষিণ দিকের অথবা স্তূপের দিকের অংশ এবং (২) উত্তর

দিকের অথবা সঙ্ঘারামের অংশ। কিন্তু রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনীর খননের ফলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এইরূপ বিভাগ সমীচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্দির এবং স্তূপগুলি মধ্যস্থানে ছিল এবং তাহার চারি-দিক বেষ্টন করিয়া সঙ্ঘারামগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৬ নম্বর সঙ্ঘারাম (কিটো সাহেবের সঙ্ঘারাম)।

দর্শক চৌখণ্ডী স্তূপ হইতে অর্দ্ধ মাইল আসিয়া প্রথমে পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ (নম্বর ৬) দেখিতে পাইবেন। ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটী মেজর কিটো (Major Kittoe) সাহেব খনন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সমাজে ইহা কিটোর সঙ্ঘারাম নামে বিদিত। খনন বিবরণ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে মেজর কিটো ইহলোক ত্যাগ করেন বলিয়া জেনা-রল কানিংহাম সাহেবের প্রথম রিপোর্টে সেই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১০৭ ফিট ছিল এবং অন্যান্য বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ন্যায় ইহার মধ্যে একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া শিলাস্তম্ভশোভিত পথ ছিল। এই পথ অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীরা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেন। সর্ব্বসমেত ২৮টী প্রকোষ্ঠ ছিল। প্রকোষ্ঠগুলি এত ছোট যে মাত্র একজন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী তাহাতে বাস করিতে পারিতেন। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের

পৃথক্ পৃথক্ প্রবেশ দ্বার ছিল। উত্তরদিকের মধ্যবর্ত্তী ঘরটী অন্যান্য ঘর হইতে আয়তনে বৃহত্তর এবং তথায় মূর্ত্তির পাদপীঠ ছিল বলিয়া জেনারল কানিংহাম এই ঘরটিকে সঙ্ঘারামের দেবালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি অনুমান করেন যে সঙ্ঘারামের প্রবেশপথ দক্ষিণদিকে ছিল এবং এইদিকের মধ্যবর্ত্তী গৃহে কারুকার্য্যখচিত সমচতুর্ভুজ প্রস্তরখানি সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্য্যের বসিবার আসন ছিল।

জেনারল কানিংহামের খননের পরে এই সঙ্ঘারামের অধিকাংশভাগই ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় মাটির উপর এত অল্প দেখা যাইত যে ইহাকে সঙ্ঘারাম বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থান পুনরায় খননের ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে, উত্তরদিকের যে বড় ঘরটী জেনারল কানিংহাম সঙ্ঘারামের মন্দির (chapel of the monastery) বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে প্রবেশপ্রকোষ্ঠ। জেনারল কানিংহাম বাহিরের দেওয়ালের নিকট তিনটী ছোট ঘর একেবারেই দেখিতে পান নাই। সেই তিনটীর একটী দুয়ার বা ফাটক এবং বাকী দুইটী প্রতিহার কক্ষ (guard-room)। প্রায় সমস্ত সঙ্ঘারামেই প্রতিহার কক্ষ বা ফাটক দেখিতে পাওয়া

যায়। যে দুইটী বড় বড় পাথর জেনারল কানিংহাম মূর্ত্তির পাদপীঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সে দুইটী প্রকৃতপক্ষে প্রবেশপ্রকোষ্ঠের দেহলী (threshold) এবং ইহার গর্ত্তগুলিতে কাঠের চৌকাঠ লাগান থাকিত। এই সঙ্ঘারাম দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল এবং ঐ দিকের মাঝের ঘরটাই মন্দির বলিয়া বোধ হয়। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বদিকে সঙ্ঘারামের আরও একটী প্রাঙ্গণ ছিল। শৈব, বৈষ্ণবাদি মূর্ত্তি রাখিবার জন্য নির্ম্মিত ঘরের দ্বারা এই প্রাঙ্গণটা ঢাকা পড়িয়াছে। মেজর কিটো কর্ত্তৃক খোদিত সঙ্ঘারামটী মধ্যযুগের এবং তাহার ভিতের নীচে আর একটা প্রাচীনতর সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। প্রথমটার মেঝের দুই ফিট নীচে দ্বিতীয়টার মেজে পাওয়া যায়। এই সঙ্ঘারামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দুইটা ছোট ঘর খুঁড়িয়া এই প্রাচীন সঙ্ঘারামের অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে। এই দুইটী ছোট ঘরে দুই স্তর মেঝে বাহির হইয়াছে। উপরের মেঝেটিতে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর অক্ষরে "যে ধর্ম্ম হেতু . . ." এই শ্লোকযুক্ত একটী শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। নীচের মেঝেটির উপরে বুদ্ধের গন্ধকুটি বা মন্দিরের চিত্র সম্বলিত ১০।১২টি মাটির শীল বা মোহর পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত শীলমোহরের অক্ষর খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর। প্রাচীন সঙ্ঘারামটী

এই সমস্ত শীলমোহর অপেক্ষা অনেক পুরাতন, কারণ, ইহা ১৭½" × ১১" × ২½" আকারের ইটে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই আকারের ইট সাধারণতঃ কুষাণ যুগের ইমারতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সঙ্ঘারামের উঠানের মাঝখানের কূপটি প্রাচীন সঙ্ঘারামেরই সমসাময়িক, কেবল উপরের গাঁথনি এবং জল তুলিবার কপিকল আধুনিক। এই কূপের জল মিস্ট এবং সারনাথের বৌদ্ধ যাত্রীরা ইহা অতি আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকেন।

সঙ্ঘারামের চওড়া প্রাচীর দেখিয়া জেনারল কানিংহাম সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বাড়ীটা তেতলা বা চৌতলা ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েৎসঙ সারনাথে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে ৩০টী সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

মেজর কিটোর খননের ফলে জানিতে পারা যায় যে এই সংঘারামটিতে একদিন সহসা আগুন লাগায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মুখের গ্রাস ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিটো সাহেব খননকালে একটী ক্ষুদ্র কুলঙ্গীতে গমের আটার রুটি পাইয়াছিলেন এবং রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনীও পূর্ব্বোক্ত ছোট দুইটী ঘরে অনেকগুলি মাটির হাঁড়িতে ভাতের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন।

৭ নম্বর সঙ্ঘারাম।

৬ নম্বর সঙ্ঘারামের পশ্চিম দিকে ১৯১৮ সালের খননের ফলে এই জাতীয় আর একটী বাড়ী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারও মাঝখানে একটী পাকা উঠান। উঠানটী লম্বা চওড়ায় ৩০ ফিট এবং ইহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী কূপ আছে। উঠানের চারিদিকের ছোট ছোট কক্ষগুলির কোন চিহ্নই নাই, কিন্তু তাহাদের সম্মুখের দেওয়াল এবং পাকা বারান্দার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্দার পাথরের থামের ২।১টি পাদপীঠ (base) এখনও স্থান-চ্যুত হয় নাই। এই ছোট সঙ্ঘারামের ভিত্তির উচ্চতা এবং ইহার নির্ম্মাণে ভগ্ন ইষ্টকের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যে ইহা সর্ব্বশেষে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই সঙ্ঘারামের কূপ হইতে আবিষ্কৃত মধ্যযুগের লিপিগুলি এই কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। এই কূপ হইতে প্রাপ্ত একটী শীলমোহরের ছাঁচে (ব্যাস ১$\frac{১}{৪}$") "শ্রীশিষ্যদ" নামক এক ব্যক্তির নাম উল্টা অক্ষরে লেখা আছে। সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য এই বাড়ীটী দান করিয়াছিলেন। এই কূপে একটী পাতলা তামার পাত পাওয়া গিয়াছে, উহার ধারগুলি একটু একটু মোড়া। ইহার উপরে "যে ধর্ম্ম হেতু প্রভবা . . . " শ্লোকটি খোদিত আছে।

বারান্দার স্তম্ভের পাদপীঠগুলির ভগ্নাবস্থা এবং উঠানের ইটের মেঝের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে এই সঙ্ঘারামটী পূর্ব্বোক্ত অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হইয়া থাকিবে। এই সঙ্ঘারামের নীচেও আর একটী সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ।

নক্সার লাল রেখা ধরিয়া উত্তর-পশ্চিমে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটা বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই স্তূপটী জগৎসিংহ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া এতদিন ইহা 'জগৎসিংহ' স্তূপ নামে পরিচিত ছিল। এই স্তূপ সম্ভবতঃ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী ইহার ধর্ম্মরাজিকা নাম প্রদান করিয়াছেন। এই স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত পাষাণের আধারের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (৩৩ পৃঃ)। জগৎসিংহের লোকেরা এই আধারের মধ্যে একটী সবুজ বর্ণের মর্ম্মরাধার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই মর্ম্মরাধারে দেহের ভস্মাবশেষ এবং কয়েকটী মুক্তা ছিল। এই স্তূপের উপরে প্রাপ্ত গৌড়াধিপ মহীপালের ১০৮৩ সম্বতের লিপিযুক্ত বুদ্ধ মূর্ত্তির [বি (সি) ১] নিম্নভাগের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (৩০ পৃঃ)। জগৎসিংহের খননের পর এই স্তূপের কঙ্কাল মাত্র অব-

শিষ্ট ছিল। ইহা সত্ত্বেও ১৯০৭-৮ সালে এই স্তূপের নিম্ন-ভাগের চারিদিক খননের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে স্তূপটীর বহির্ভাগে ইটের গাঁথনি ছিল। এই স্থানের অশোক নির্ম্মিত আদিম স্তূপের পাদদেশের ব্যাস ছিল ৪৯ ফিট, কিন্তু পরে ইহার পার্শ্বে ইট গাঁথিয়া ১১০ ফিটে বর্দ্ধিত করা হয়। মৌর্য্য যুগের অন্যান্য ইমারতের ইটের মতন অশোকের আদিম স্তূপের ইটগুলি বৃহদাকার। প্রায় সমস্ত ইটগুলি একদিকে সরু ও অপরদিকে মোটা (wedge-shaped); সরু দিকটী স্তূপের কেন্দ্রের অভিমুখে বসান ছিল; কিন্তু গাঁথনির বাঁধন পাকা নয়। এই যুগের অন্যান্য স্তূপের মতন এই ধর্ম্মরাজিকা স্তূপটী প্রায় অর্দ্ধ গোলাকৃতি ছিল। এই স্তূপটীর শীর্ষদেশেও অবশ্য হর্ম্মিকা ও ছত্র ছিল। ছত্রের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই কিন্তু হর্ম্মিকার বেদিকা বা প্রাচীরের ভগ্নাংশ প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গর্ভগৃহে দৃষ্ট হয়। এই বেদিকাটী একখানি বিরাট প্রস্তরখণ্ড হইতে প্রস্তুত এবং ইহার স্তম্ভের এবং সূচীর (cross-bar) গাত্র অশোক স্তম্ভ গাত্রের ন্যায় অতি মসৃণ।

আদিম ধর্ম্মরাজিকার প্রথম সংস্কার হইয়াছিল আনুমা-নিক খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে। দ্বিতীয় সংস্কার আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে (২৭ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েঙ্-সঙ্ এই স্তূপটীকে শত ফিট উচ্চ এবং ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। গুপ্ত যুগের সংস্কারের ফলেই বোধ হয় স্তূপের উচ্চতা এতটা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে খোদিত ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের প্রদক্ষিণ পথটা দ্বিতীয় বারের সংস্কারের সময় নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। প্রদক্ষিণ পথের বেষ্টণকারী প্রাচীর চার ফিট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার চারিদিকে চারিটা দ্বার ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে স্তূপটী পুনঃ সংস্কৃত হয়। এই সময় প্রদক্ষিণ পথটা ভরিয়া দেওয়া হয় এবং স্তূপে উঠিবার জন্য চারিটা সিঁড়ি এক এক খানি অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। দক্ষিণ সোপানের উপরের ধাপে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র লিপিটী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর অক্ষরে লেখা। এই স্তূপটার শেষ সংস্কার খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্মচক্রজিনবিহার নির্ম্মাণের সময়ে সাধিত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ছোট ছোট স্তূপ দৃষ্ট হয়। পশ্চিম দিকের তৃতীয় স্তূপের কুলঙ্গীতে "দেয়ধর্ম্মোয়ম ধনদেবস্য" লিপিযুক্ত একটী বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটী [বি (বি) ১০এ] খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং তৎকালীন কোন ইমারত হইতে এই স্তূপে নীত হইয়া

থাকিবে। এই স্তূপটী ও উত্তরের কয়েকটী স্তূপ একাধিকবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মরাজিকার উত্তরে ও প্রধান মন্দিরে যাইবার অর্দ্ধ পথে মথুরার রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত বিরাট একটী বোধিসত্ত্ব [বি (এ) ১] মূর্ত্তি (চিত্র ৭) ও ছত্রদণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এই দণ্ডে ও মূর্ত্তিতে কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের লিপি খোদিত আছে।

প্রধান মন্দির।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের ৪০ হাত উত্তরে একটী বৃহদাকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নক্সায় এই ধ্বংসাবশেষ প্রধান মন্দির (Main Shrine) বলিয়া চিহ্নিত। এখনও পর্য্যন্ত এই মন্দিরটী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী এবং উপাদান হইতে অনুমান হয় যে ইহা আরও কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আদি মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪৫′ ৬″ ছিল এবং ইহার দেওয়াল ১০ ফিট পুরু ছিল। উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে কক্ষ ছিল এবং সেগুলিতে বহির্দেশ হইতে প্রবেশ করিতে হইত। এই মন্দিরের প্রাচীর এখন কোন জায়গায় ১৮ ফিটের অধিক উচ্চ নাই। এই প্রাচীরের ভিতরদিকে কোন নক্সা ছিল না, কিন্তু মন্দিরের বহির্ভাগে গোলাকার কুলঙ্গী

দেখিতে পাওয়া যায়। কুলঙ্গীর ভিতরে ছোট ছোট থাম, থামের মূলদেশ ঘটাকৃতি এবং উপরিভাগ চারিকোণা মাথালে (bracket capital) পরিশোভিত। এই সমস্ত নক্সা গুপ্ত যুগের শিল্প নমুনা। মন্দিরটী একই উপাদানে নির্ম্মিত এবং বাহির দেওয়ালের নক্সা অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান আছে; কেবল দুয়ারের চৌকাঠ এবং কোন কোন স্থানে দেওয়ালের ভিতে পরে ঠাসা (underpinning) দেওয়া হইয়াছিল। মন্দিরটী ১৪½″×৮⅓″×২¼″ হইতে ১৫½″×৯½″×২½″ আকারের ইটে এবং কাদায় নির্ম্মিত। ১০ ফিট স্থূল প্রাচীর দেখিয়া মনে হয় যে মন্দিরের শিখর খুব উচ্চ ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা দেখিতে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মতন ছিল।

নির্ম্মাণের অনেক দিন পরে মন্দিরের ঊর্দ্ধভাগ ভগ্নোন্মুখ হইয়া পড়ায় আদি মন্দিরের ভিতরের তিনদিকে ১১ ফিট চওড়া আর একটী দেওয়াল গাঁথা হয়। ফলে মন্দিরের গর্ভগৃহ সমচতুষ্কোণ ২৩′ ৬″ একটী ছোট ঘরে পরিণত হয়। এই সময় মন্দিরের পিছনে মূর্ত্তি বসাইবার জন্য একটী বড় চারিকোণা চত্বর গাঁথা হয়। এই চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটী সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

উত্তর এবং পশ্চিমের ছোট ঘরের মূর্ত্তি দুইটীও পাওয়া যায় নাই কিন্তু সেই দুইটী যে ইটের বেদির উপর স্থাপিত ছিল তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরে গুপ্তযুগের একটী শিরোহীন দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; তাঁহার দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা। অন্য দুইটী ছোট ঘরেও বোধ হয় এই জাতীয় মূর্ত্তি ছিল। ওরটেল সাহেব দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরের মেঝে খুড়িয়া মৌর্য্য যুগের একটী সমচতুষ্কোণ বেদিকা (railing) পাইয়াছিলেন। এই বেদিকার মধ্যে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত ছোট স্তূপ আছে। মির্জাপূর জেলার অন্তর্গত চুনারের একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড খোদিয়া এই বেদিকাটী প্রস্তুত এবং অশোকের সময়ের অন্যান্য শিল্প নিদর্শনের ন্যায় ইহাতেও উজ্জ্বল বজ্রলেপ (পালিস) দেখিতে পাওয়া যায়। এই বেদিকা ৮′ ৪″ লম্বা ও ৪′ ৯″ উচ্চ। ইহার প্রত্যেক দিকে চারিটী চারিকোণা স্তম্ভ ও প্রত্যেক দুইটী থামের মধ্যে তিনটী সূচী (cross-bar) আছে।

এই বেদিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের মূলদেশে উৎকীর্ণ দুইটী প্রাচীন লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সর্ব্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষু-দিগের অধিকারে ছিল। পূর্ব্ব দিকের শিলা লিপিটী

দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার শেষ কথাটী খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন লিপির পরিশিষ্ট এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই লিপিটীর অন্য অংশে অন্য কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম খোদিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শতাব্দীতে সর্ব্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু-গণ পূর্ব্বের লিপিটী বিলুপ্ত করিয়া নিজেদের নাম উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহারা সারনাথে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকের বেদিকায় সংস্কৃত ভাষায় উক্ত শিলা লিপিটী পুনরায় খোদিত করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বকথিত ইষ্টক স্তূপটী ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে খনিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় নাই। মৌর্য্য যুগের এই প্রস্তর বেদিকা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার কতকটা অংশ ভাঙ্গিয়া প্রাচীন যুগেই লুপ্ত হইয়াছিল। এই বেদিকা আদৌ কি জন্য নির্ম্মিত তাহাও অনেক দিন ধরিয়া সন্দেহের বিষয় ছিল। দুইটী কারণ সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত ; প্রথমতঃ—ইহা কোন পবিত্র স্থান, যথা যেখানে বুদ্ধদেব বসিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই স্থানটী চিহ্নিত করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল ; অথবা ইহা অশোক স্তম্ভের বেষ্টণী ছিল। এই দুইটী মতই ভুল বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে ; কারণ ইহা যে ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের উপরে বসান ছিল এবং ইহার

ভিতরে ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের ছত্রদণ্ড গাঁথা ছিল তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ইহা ভূমিকম্পে স্থানচ্যুত হইয়াছিল।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রধান মন্দিরটী গুপ্তযুগে নির্ম্মিত; কিন্তু ইহার নির্ম্মাতার নাম এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই মন্দিরের প্রাচীনতম মেঝেটী দক্ষিণ কক্ষে স্থাপিত অশোক বেদিকার মেঝের সমসাময়িক। এই কক্ষে অশোকের বেদিকা (balustrade) বোধ হয় অনেক শতাব্দী ধরিয়া দেখা যাইত। পরবর্ত্তী কালে প্রধান মন্দিরের চারিপার্শ্বস্থ জমী উঁচু হইয়া যাওয়ায় এই বেদিকায় যাইবার জন্য একটী সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত হয়। প্রধান মন্দিরের তিনদিকের কক্ষগুলির প্রবেশপথ দুইটা বিভিন্ন যুগে তৈয়ারী হইয়াছিল। আগেকার পাথরের চৌকাঠগুলি লাল রঙে রঞ্জিত এবং লতালঙ্কারে (scroll work) পরিশোভিত ছিল। এই চৌকাঠগুলি সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের চৌকাঠ-গুলিতে কোনরূপ কারুকার্য্য দেখা যায় না। এই সময়ে গুপ্ত এবং পরবর্ত্তী যুগের ইমারতের উপাদান লইয়া বাহিরের দেওয়ালের নিম্নদেশ মেরামত হইয়াছিল। এই সংস্কার কার্য্যে কোনরূপ নৈপুণ্য দেখা যায়

না। মন্দিরের বাহিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রস্তর-খানিতে মধ্যযুগের শেষভাগের নাগরী অক্ষরে ‘ সুহিল ’ কথাটী উৎকীর্ণ থাকায় প্রধান মন্দিরের নির্ম্মাণ কাল লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে, কারণ এই লেখা যুক্ত পাথর দেওয়ালের ভিতে গাঁথা ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেন যে প্রধান মন্দিরটী গুপ্তযুগের অনেক পরে নির্ম্মিত। কিন্তু এখন বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এই মন্দিরটী নির্ম্মাণের অনেক পরে ইহার সংস্কারের সময় এই পাথরগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল ; সুতরাং আদি মন্দিরের সঙ্গে ইহাদের কালগত বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের সহিত প্রধান মন্দিরের অবস্থিতি এবং অশোকের সমসাময়িক ইমারতাদির সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকায় অনুমান হয় যে হুয়েন্-সঙের মতে যে মন্দিরটী বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্ম প্রচারের স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহা সেই মন্দির।

প্রধান মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৪০ ফিট বিস্তৃত খোয়ার মেঝে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মেঝেটী অনেক বার বর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। আরও পূর্ব্ব দিকে পাথরে বাঁধান পথ আছে। এই পথে ১৯০৬-৭ এবং ১৯০৭-৮ সালের খনন কালে অনেক গুলি শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত

হয়। ১৯১৪-১৫ সালে হারগ্রীবস্ সাহেব এখানে দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বুদ্ধগুপ্তের সময়ের তিনটী মূর্ত্তি পাইয়াছেন।

প্রধান মন্দিরের অঙ্গনটী লম্বায় আন্দাজ ২৭১ ফিট এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে ইটের প্রাচীর ছিল কিন্তু এই প্রাচীরের অধিকাংশ পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের মাঝখান দিয়া উঠানে নামিবার সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দুইটী নির্ম্মাণ করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন যুগের খোদাইকরা পাথর ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সকল পাথরের মধ্যে দুই একটী গুপ্তযুগের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রধান মন্দিরের অঙ্গনে বিভিন্ন আকারের স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া ছোট ছোট মন্দিরও দৃষ্ট হয়। এইশ্রেণীর একটী দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত এবং আর একটী নক্সায় ১৩৭ সংখ্যক চিহ্নিত। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন ইমারতগুলি গুপ্তযুগের। তন্মধ্যে একটী স্তূপের ভিত্তিমাত্র এখনও বর্ত্তমান। এই ভিত্তির চারিদিকে চারিটী সুন্দর নক্সাকাটা কুলঙ্গী (niche) ছিল এবং এক কালে এই কুলঙ্গীর মধ্যে এক একটী বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। তদ্ব্যতীত অনেকগুলি প্যানেল (panel)

আছে এবং এই সকল প্যানেলের (panel) দুই পার্শ্বে অর্দ্ধোদ্ভিন্ন থাম (pilaster), মধ্যভাগ নানা রকমের ফুল (rosette), কীর্ত্তিমুখ ও অন্যান্য কারুকার্য্যে শোভিত। এই জাতীয় শিল্প সাধারণতঃ গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল। এই স্তূপটী এখনও খুড়িয়া দেখা হয় নাই; সুতরাং ইহার মধ্যে অতীতের কোন নিদর্শন পাওয়া যাইবে কি না বলা যায় না।

১৩৬ সংখ্যক স্তূপ অপেক্ষা ইহার নিকটবর্ত্তী মন্দিরটী পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত। এই মন্দিরের বহির্ভাগ ৩৭ ফিট লম্বা ও প্রায় ২৮ ফিট চওড়া এবং খননের সময় ইহার মধ্যে দুইটী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরের অঙ্গনের আর সমস্ত ইমারত মধ্যযুগের। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মানস বা মানত রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। অঙ্গনের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের দক্ষিণাংশে এক শ্রেণীতে স্থাপিত ছয়টী বা সাতটী স্তূপ সর্ব্বপ্রথমে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু সারনাথে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের ভস্মাবশেষ ইহাদের মধ্যে রক্ষিত আছে।

প্রধান মন্দিরের অঙ্গনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত মন্দিরটী ধর্ম্মচক্রজিনবিহারের সমসাময়িক। এই মন্দিরের নক্সা দেখিলে ইহার যুগ নির্দ্ধারণ করা

যায়। আর্য্যবর্ত্তের ধরণে এই মন্দিরটী শিখরযুক্ত; মন্দিরের গর্ভগৃহ (cella) সমচতুষ্কোন এবং মুখমণ্ডপ (portico) যুক্ত। এই মন্দিরের পিচনের দেওয়ালে অবস্থিত পাদপীঠের লাঞ্ছন (cult-mark) দেখিলে মনে হয় যে বারাহী বা মারীচীর (অর্থাৎ বৌদ্ধ ঊষাদেবীর) মূর্ত্তি ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে ঐ দেবীর দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট অবস্থার মূর্ত্তি খোদিত আছে। তদ্ব্যতীত পাদপীঠের উত্তর পার্শ্বে খোদিত পুরুষ এবং স্ত্রী মূর্ত্তি নিশ্চয়ই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিয়া মনে হয়। মূলমূর্ত্তিটী ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটী খননের পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত বা ধ্বংস হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, সারনাথের আরও দুই তিনটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মত, হিন্দু দেবতার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল; কারণ ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ভৈরব মূর্ত্তি (২১/২′ উচু, ১/৪′ চওড়া) এবং ছোট পাদপীঠে পাঁচটী শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছিল।

এই অঙ্গনে একটী ১ ফুট ৯ ইঞ্চি হইতে ২ ফিট ৭ ইঞ্চি চওড়া এবং ৩ ফিট গভীর পাকা নর্দ্দমা ১৯২১-২২ সালের খননে বাহির হইয়াছে। এই চত্বরের জল নিষ্কাশের জন্য এই নর্দ্দমাটী খোয়ার তৈয়ারী এবং

খণ্ড খণ্ড পাথরে আচ্ছাদিত ছিল। এই সব পাথরের মধ্যে সর্দ্দলের (lintel), বেদিকার থামের ও ছত্রের টুক্‌রা পাওয়া গিয়াছে। নর্দ্দমাটী উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫০ ফিট দূরে ধর্ম্মচক্রজিনবিহারের দুই নম্বর তোরণের নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ধর্ম্মচক্রজিনবিহারটী প্রধান মন্দির অপেক্ষা অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অঙ্গনের বাহিরে ইটের তৈয়ারী পাঁচ ফিট গভীর এবং লম্বা চওড়ায় সাত ফিট একটা কুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় কুণ্ড ডাক্তার ভোগেল কাশিয়ার একটা সঙ্ঘারামে (Monastery L-M) পাইয়াছেন। এই কুণ্ডটিতে জল থাকিত ও সেই জল লইয়া ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীরা হাত পা ধুইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। পর্ব্বদিনে অর্থাৎ উপোসথ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দিনে যখন তাহারা বিনয়-ধর্ম্মের জন্য (confession of sins) আসিতেন তখন এই জল ব্যবহৃত হইত।

প্রধান মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের আর একটা ইমারতের উল্লেখ করা উচিত। এই ইমারতটা চারিকোণা, নক্সায় ইহা ৩৬ সংখ্যায় চিহ্নিত। সম্ভবতঃ ইহা ব্যাখ্যান গৃহ (lecture hall)। খননের সময় ইহা প্রধান মন্দিরের চারিদিকের উচ্চ চত্বরে ঢাকা ছিল। ইহার দেওয়াল গুলি এত পাতলা যে বোধ হয় উপরে কোন কালে ছাদ

ছিল না অথবা কাঠের থামের উপরে খুব হালকা কাঠের ছাদ ছিল। পিছনের দেওয়ালে একটী ইটের বেদী আছে। সম্ভবতঃ সঙ্ঘের আচার্য্য (teacher) বা সঙ্ঘস্থবির (chairman) এই স্থানে বসিতেন। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের প্রাচীরের বাহিরে একটী পাথরের বেদিকা ছিল এবং এই বেদিকার কতক অংশ ভাঙ্গিয়া উত্তর দিকের দেওয়ালে পড়িয়াছে। এই বেদিকার [ডি (এ) ৩৯] উপরে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত একখানি লিপি[১] আছে। প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবস্থিত ছোট বড় ইমারতগুলি যাত্রীগণের তীর্থাগমন-স্মৃতি স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকগুলি ঘন সংবদ্ধ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ইমারত অনেকবার বাড়ান হইয়াছে অথবা নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান হয় ঐ স্থান বৌদ্ধদিগের নিকট বিশিষ্টরূপে পবিত্র ছিল। উত্তর-পূর্ব্ব দিকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্তূপটীর (নক্সার ৪০ সংখ্যা) উপরের গাঁথনী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খননকালে ভিতের নীচে কতকগুলি কাঁচামাটির শীল (seals) এবং আরও নীচে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি

(১) ভিক্ষুনিকায়ে সম্মিতিকায়ে দানং আলমবনং।

পাওয়া গিয়াছিল। শীলগুলিতে (seals) সম্বোধি সময়ের বুদ্ধমূর্ত্তি এবং খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর অক্ষরে "যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা..." শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মধ্য-যুগের শেষে এই স্তূপটী মেরামত করিবার সময় শীলগুলি (seals) এবং পাথরের মূর্ত্তিগুলি নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

নক্সায় ১৩ সংখ্যক চিহ্নিত স্তূপটী প্রধান মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং ইহার নিকটে পালি লিপি[১] যুক্ত পাথরের ছত্রের একটী অংশ [ডি(সি)১১] পাওয়া গিয়াছে।

অশোক স্তম্ভ।

১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব প্রধান মন্দিরের পশ্চিম দিকে অশোক স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। স্তম্ভশীর্ষ এবং কয়েকটী টুক্‌রা পশ্চিম দেওয়ালের নিকট পাওয়া যায়। খননের সময় ঐ মন্দিরের চারিদিকে খোয়ার মেঝের উপরে অশোক স্তম্ভের নিম্নাংশটী স্থাপিত ছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে প্রধান মন্দির নির্ম্মাণের বহু শতাব্দী পরে অশোক স্তম্ভ ধ্বংস হইয়াছিল। স্তম্ভটীর বর্ত্তমান উচ্চতা ১৭ ফিট এবং নিম্নদেশের ব্যাস ২ ফিট ৬ ইঞ্চি। ইহার ভগ্নাংশগুলি দেখিয়া মনে হয় যে

(১) *A. S. R.*, 1906-07, pp. 95-96.

সিংহচূড়াটী লইয়া স্তম্ভের উচ্চতা ৫০ ফিট ছিল। ৮′×৬′×১½′ আয়তন বিশিষ্ট একখানি প্রাথরের উপরে স্তম্ভটা স্থাপিত। অন্যান্য অশোক স্তম্ভের ন্যায় সারনাথ স্তম্ভটাও একখানি অখণ্ড চুনার প্রস্তরে নির্ম্মিত। স্তম্ভের সিংহচূড়াটী (এ ১) সাত ফিট উচ্চ এবং ইহার উপর যে ধর্ম্মচক্র ছিল তাহার ব্যাস ২¾ ফিট। স্তম্ভশীর্ষটী (চিত্র ৫) এবং চক্রের কয়েকটি খণ্ড সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সমস্ত স্তম্ভটী খুব মসৃণ ও চিক্কণ। স্তম্ভের ভূমিতে প্রোথিত পাঁচ হাত পরিমিত অংশ অমার্জ্জিত। অমার্জ্জিত অংশের নীচেই পুরাতন মেঝের চিহ্ন বর্ত্তমান। এই পুরাতন মেঝে ও বর্ত্তমান মেঝেটীর মধ্যে অনেকগুলি মেঝের অস্তিত্ব খননে প্রকাশ পাইয়াছে। এই মেঝে উত্তর হইতে দক্ষিণে ১৮′১০″ লম্বা এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৬′ ৯″ চওড়া। ইহার ২½′ নীচে চারিটী ইটের দেওয়াল পাওয়া গিয়াছে। এই দেওয়ালগুলি অশোক স্তম্ভ বেষ্টণ করিয়াছিল এবং উহার চারিদিকে বেদী ছিল। এই দেওযালগুলি অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় পরে ইহার উপরে অশোক স্তম্ভের রক্ষার জন্য নির্ম্মিত নূতন ছত্রীর স্তম্ভগুলি বসাইবার সময় পুরাতন ইট সংগ্রহ করিয়া ইহাকে মেরামত করা হয়। ছত্রীর ইটের মেঝেটী অশোকস্তম্ভের পাদদেশের সর্ব্ব পুরাতন মেঝের দুই ফিট নয় ইঞ্চি উপরে অবস্থিত।

অশোক অনুশাসন লিপিটা স্তম্ভের গাত্রে খোদিত আছে। স্তম্ভটা পড়িয়া যাইবার সময় খোদিত লিপির একাদশ পংক্তির মধ্যে প্রথম তিন পংক্তির অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাকী পংক্তিগুলি এখনও সুস্পষ্ট আছে। এই অনুশাসন লিপি সম্রাট অশোকের সময়ে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত এবং তৎকালীন বৌদ্ধসঙ্ঘের অন্তর্গত কোনও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী যাহাতে সঙ্ঘের প্রতিকূল আচরণ না করেন সেজন্য সাবধান করিয়া দিতেছে। অনুশাসনটা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। দেবা [নং-পিয়ে পিয়দসি লাজা]

২। এল . . . . .

৩। পাট [লিপুতে] . . . . যে কেন-পি সংঘে ভেতবে এ চুংখো

৪। ভিখু বা ভিখুনি বা সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি দুসানি সংনংধাপয়িয়া আনাবাসসি

৫। আবাসয়িয়ে [।] হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে [।]

৬। হেবং দেবানংপিয়ে আহা [।] হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবাতি সংসলনসি নিখিতা

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং-
তিকং নিখিপাথ [।] তে পি চ উপাসকা
অনুপোসথং যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে অনুপোসথং
চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে

৯। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানি-
তবে চ [।] আবতে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন [।]
হেমেব সবেসু কোটবিষবেসু এতেন

১১। বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা [।][১]

অনুবাদ :—

১। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা . . . .

৩। পাটলীপুত্রে . . . . . . সঙ্ঘে কেহ
ভেদ উপস্থিত করিতে পারিবে না।

৪। ভিক্ষুই হ'ক বা ভিক্ষুণী হ'ক যে সঙ্ঘে ভেদ
উপস্থিত করিবে সে অবশ্য শ্বেতবস্ত্র ধারণ
করিয়া অনাবাসে বাস করিবে।

৫। এবম্প্রকারে এই শাসন ভিক্ষুসঙ্ঘে এবং
ভিক্ষুণীসঙ্ঘে বিজ্ঞাপিত হ'ক।

---

(১) Hultzsch, *Inscriptions of Asoka*, Oxford, 1925, pp. 161—164.

৬। দেবতাদের প্রিয় এইরূপ বলিতেছেন—এই লিপির একখণ্ড প্রতিলিপি তোমাদের সংসরণে থাকুক ; এবং আর একখানি প্রতিলিপি উপাসকগণের নিকট রাখ।

৭-৯। প্রত্যেক উপবাসের দিনে আসিয়া উপাসকেরা এই লিপির প্রতি শ্রদ্ধাবান হউন ; প্রত্যেক উপবাসের দিনে মহামাত্রগণ আসিয়া এই লিপির প্রতি শ্রদ্ধাবান হউন এবং ইহার মর্ম্ম অবগত হউন।

১০-১১। তোমাদের অধিকার যতদূর বিস্তৃত ততদুর এই আদেশ প্রচারিত কর। এই প্রকারে সকল দুর্গের আশ্রিত প্রদেশে এই আদেশ প্রচারিত কর।

অশোকের অন্যান্য অনুশাসনের মত এই অনুশাসনেও সম্রাট অশোককে "দেবানাং পিয়" এবং "পিয়দসি লাজা" অর্থাৎ দেবতাদিগের প্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা বলা হইয়াছে। এই রাজাই যে মৌর্য্যরাজ অশোক তাহা সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মাস্কি গ্রামের নিকট আবিষ্কৃত আর একটী অনুশাসন হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কারণ উহাতে অনুশাসনের কর্ত্তাকে "দেবানাং পিয় অশোক" বলা হইয়াছে।

এই মৌর্য্য লিপি ব্যতীত স্তম্ভগাত্রে আরও দুইটী লিপি উৎকীর্ণ আছে। একটী কণিষ্কাব্দের চত্বারিংশৎ

বৎসরে অশ্বঘোষ নামক রাজার রাজত্ব কালে খোদিত এবং অপরটী গুপ্ত সময়ে (আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ। লিপি দুইটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১।.... পারিগেযহে রজ্ঞ অশ্বঘোষস্য চতরিশে সবছরে হেমতপখে প্রথমে দিবসে দসমে

২। আ[চা]র্য্যনং স[স্মি]তিয়ানং পরিগ্রহ বাৎসী-পুত্রিকানাং

প্রথমটির অনুবাদ :—

রাজা অশ্বঘোষের রাজত্বের চত্বারিংশ বৎসরে হেমন্তের প্রথম পক্ষে দশম দিবসে ......

দ্বিতীয়টির অনুবাদ :—

বাৎসীপুত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সম্মিতীয় শাখার আচার্য্যগণের দান।

অশোক স্তম্ভের পশ্চিম দিকের অংশ

১৯১৪-১৫ সালে হারগ্রীবস্ সাহেব কর্ত্তৃক অশোক স্তম্ভের পশ্চিমদিকের অংশে মৌর্য্যযুগের স্তর পর্যন্ত খনিত হয়। খননে একটা চৈত্যাকার মন্দির (apsidal temple) ও তদুপরি পরবর্ত্তী যুগের একটা সঙ্ঘারামের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। তক্ষশীলা ও সাঁচীতে চৈত্যাকার মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের সম্মুখের

ভাগ চতুষ্কোণ কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ অথবা মন্দিরের যে অংশে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি। আমাদের দেশে ঠাকুরঘরে বা মন্দিরে চারিকোণা বেদী বা আর্য্যপট্ট থাকে, কিন্তু বৌদ্ধদিগের মন্দিরে গোলাকার স্তূপ থাকিত এবং তাহার পশ্চাদংশ স্তূপের অর্দ্ধাকারে, চারিকোণা না করিয়া গোলাকারে, তৈয়ারী করা হইত। এই জাতীয় মন্দিরকে চৈত্যমন্দির (apsidal) বলা হয়। সারনাথের চৈত্যমন্দিরটী ২১″× ১৩″×৪″ আকারের ইটে নির্ম্মিত, সুতরাং ইহা মৌর্য্য বা শুঙ্গযুগের পরবর্ত্তী হইতে পারে না। এই সমস্ত ইমারতের মধ্যে অনেকগুলি সুন্দর খোদাই করা মৌর্য্য বা শুঙ্গযুগের মূর্ত্তির টুকরা এবং ইমারতের পাথরের টুকরা পাওয়া গিয়াছে। এই গুলি বোধ হয় অন্য ধ্বংসাবশেষ হইতে আনিয়া এই অংশের জমি ভরাট করিবার জন্য ফেলা হইয়াছিল। ইহা স্থির যে যে সমস্ত মন্দিরে এই সমস্ত খোদাই করা পাথর বা মূর্ত্তি ছিল তাহা কুষাণ যুগের শেষ ভাগে বিধ্বস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত মন্দির কেমন করিয়া ধ্বংস হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আবিষ্কৃত কতকগুলি টুক্‌রা নিদর্শন স্বরূপ সারনাথ মিউজিয়মের হলঘরে তিনটি আধারে প্রদর্শিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে অশোক স্তম্ভের সিংহের উপরে যে রকম একটি পাথরের চক্র ছিল সেই

রূপ আর একটী পাথরের চক্রের টুকরা আছে। সম্ভবতঃ অপর একটী অশোকস্তম্ভের উপরে এই দ্বিতীয় পাথরের চক্রটী ছিল, কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজকেরা সারনাথে কেবল একটী অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করায় অনুমান হয় এই চক্রটী শুঙ্গ আমলের কোন স্তম্ভের শীর্ষদেশে ছিল। এই সমস্ত টুকরার মধ্যে পাথরের বেদিকার (railing) থাম ও সূচীর (cross-bar) অংশ এবং পারস্য রীতির (Indo-Persepolitan capital) অনুকরণে নির্ম্মিত কতকগুলি স্তম্ভশীর্ষ আছে।

এই স্থান হইতে প্রধান মন্দিরের উত্তর দিকে ফিরিলে একটী বিচিত্র ধরণের ইমারত দেখা যায়। এই ইমারত ১৯১৪-১৫ সালে আবিষ্কৃত হয়। ইহা আকারে গোল এবং ব্যাসে ১২′ ৭½″। এই গোলাকার ইমারত বেষ্টন করিয়া একটী প্রাচীর আছে। এই প্রাচীরের পূর্ব্ব দিকের অংশ ৭½′ উচ্চ। ইটের আকার দেখিয়া অনুমান হয় যে ইমারতটী একটী প্রাচীন স্তূপ, কিন্তু বাহিরের দেওয়ালটী বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে কোন বৌদ্ধ ভক্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চত্বর হইতে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রশস্ত পথ আছে। পূর্ব্বদিকের রাস্তার ন্যায় ইহারও উভয় পার্শ্বদেশ সারিসারি স্তূপ এবং অন্যান্য

ইমারতের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। পশ্চিমদিকের স্তূপ-শ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গৌতমবুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটী [বি (এ) ২] এবং পূর্ব্বদিকের বীথির নিকট [ডি (ডি) ১] সংখ্যক পাথরের সর্দ্দাল (lintel) আবিষ্কৃত হয়। ইহার কিছু উত্তরে সার জন মার্শেল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর একটী বেদিকার এগারটী স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই স্তম্ভগুলি এখন সারনাথ মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫০ নম্বর মন্দির

পূর্ব্বোল্লিখিত বেদিকাটী সম্ভবতঃ প্রধান মন্দিরের উত্তর অংশ খননে আবিষ্কৃত স্তূপটীর চারিপার্শ্বে বা উপরে স্থাপিত ছিল। যে স্থানে এই বেদিকাটী পাওয়া গিয়াছে সেই স্থানে গুপ্তযুগের একটী মন্দিরের মণ্ডপ অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগে এই মন্দিরটীর পুনঃসংস্কার হইয়াছিল। ইহা একটী ছোট চারিকোণা প্রকোষ্ঠ; ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে দরজা ছিল। পূর্ব্বদিকের দরজার পাথরের চৌকাট চামরধারী মনুষ্য মূর্ত্তি এবং নানাবিধ কারুকার্য্য শোভিত প্রবেশ পথের সম্মুখে এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের প্রাচারের বাহিরে কয়েকটী মূর্ত্তির পাদপীঠ সংলগ্ন আছে। এই মূর্ত্তিগুলি এক একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ছত্রের নিম্নে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল ছত্রদণ্ডের টুকরা এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান। দক্ষিণাংশে

অবস্থিত একটী পাদপীঠে গুপ্তযুগে প্রচলিত অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে 'নানাল' নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ইহার উপরে একটী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই লিপির দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণের ও এই সমস্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় নিরূপণ করা যায়। মন্দিরের উত্তর দিকের খোয়ার মেঝের উপরে আবিষ্কৃত একটী পোড়া মাটির ফলক (tablet) হইতে এই মন্দির-টীর পুনঃসংস্কারের সময় নির্ণীত হইয়াছে। এই ফল-কের উপরে আসীন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর নাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ "যে ধর্ম্ম হেতু প্রভবা. ." মন্ত্রটী লিখিত আছে। মন্দিরের ভিতরের মেঝেতে পোতা ইষ্টক বেষ্টিত একখানা পাথর ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় নাই। ইহার উপর কোন মূর্ত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ ইহা অগ্নিকুণ্ড বা হোমকুণ্ড ছিল, কারণ খনন-কালে এই মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে ভস্মরাশি ও দগ্ধকাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা ব্রাহ্মণদিগের অগ্নি-হোত্র যজ্ঞের অবশেষ বলিয়া বোধ হয়।

উত্তরদিকের অংশ।

সার জন মার্শেল সাহেবের খননে উত্তরদিকের অংশে তিনটী প্রধান সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এই সমস্ত সঙ্ঘারামে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বাস করিতেন।

এখনও অনেকগুলি সঙ্ঘারাম বোধ হয় ভূগর্ভে প্রোথিত আছে; কারণ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েঙ-সঙের আগমনকালে মৃগদাবে ১,৫০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। এই অংশের সঙ্ঘারামগুলি কুষাণবংশীয় শেষ রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত। ধর্ম্মচক্রজিনবিহার নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘারামগুলি মাঝে মাঝে সংস্কৃত হইয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। ২, ৩ ও ৪ চিহ্নিত সঙ্ঘারামগুলি ১৬ হইতে ১৮ ফিট নিম্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাণী কুমরদেবীর ধর্ম্ম-চক্রজিনবিহার

কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধরাণী কুমরদেবীর ধর্ম্মচক্রজিনবিহার নির্ম্মাণের কথা ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দের খননে আবিষ্কৃত একটী শিলালেখ [ডি (এল) ৯] হইতে জানিতে পারা যায়। বিহারটী প্রধান মন্দিরের ঠিক উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল। ইহার আবিষ্কৃত অংশ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৭৬০ ফিট লম্বা। ইহার পূর্ব্বদিকে দুইটী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ এবং পশ্চিমদিকে একটী ছোট মন্দির আছে। এই মন্দিরে যাইবার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথটীও বাহির হইয়াছে। বিহারটী ৪′ ৪″ চওড়া ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের দক্ষিণাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর এবং পশ্চিম সীমার প্রাচীর এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সম্ভবতঃ লুপ্ত হইয়াছে অথবা অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

এরূপ বিচিত্র ধরণে নির্ম্মিত বৌদ্ধ ইমারত অন্যত্র দেখা যায় না। ইহার মধ্যস্থলে একটী সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে ইমারত এবং পশ্চিমদিক উন্মুক্ত। ইমারতগুলির মেঝে মধ্যপ্রাঙ্গণ অপেক্ষা প্রায় ছয় ফিট উচ্চ ছিল। পূর্ব্বদিকের ভিত্তির নীচের সকল কক্ষগুলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ঐরূপ কক্ষের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। ভিত্তিমূলের (plinth) ভিতর ও বাহিরের প্রাচীর কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকে নির্ম্মিত। এই কারুকার্য্যের নমুনা প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ভিত্তিমূলে পরিষ্কার দেখা যায়। উপরিস্থ কক্ষগুলি লুপ্ত হইয়াছে তবে ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহা-দিগের আকার কতকটা অনুমান করা যায়। উপরের গৃহগুলির দেওয়ালের ভিত্তিমূলের সমসূত্রে ছিল এইরূপ অনুমান করিলে সমস্ত ইমারতটীর আকার ও গঠনপ্রণালী বুঝিতে পারা যায়। এই ইমারতে ব্যবহৃত অনেক প্রস্তরখণ্ড ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হওয়ায় মনে হয় বাবু জগৎসিংহ খনন কালে এই ইমারতটী আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাঙ্গণের তিনদিকে তিনটী অল্প পরিসর অলিন্দ ছিল। অলিন্দের ছাদ প্রস্তরস্তম্ভের উপরে রক্ষিত ছিল এবং অলিন্দের প্রত্যেক কোণে সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। প্রস্তরস্তম্ভের অধিষ্ঠান (base-stone) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্তম্ভ ও

অর্দ্ধোদ্ভিন্ন স্তম্ভগুলি (pilaster) প্রাচীর গাত্রে নিবিষ্ট ছিল। এই বারান্দাটী প্রায় সাত ফিট প্রশস্ত এবং ইহার ছাদ বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত ছিল। উত্তর দিকের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই সকল প্রস্তর রাখা আছে। প্রত্যেকটিতে এক একটী পদ্ম খোদিত আছে।

পূর্ব্বদিকের অলিন্দে একটী সোপানশ্রেণী, একটী প্রবেশ কক্ষ এবং কয়েকটী প্রতিহার কক্ষ ছিল। বারান্দার কোণে সমচতুষ্কোণ কক্ষগুলিতে এবং প্রতিহার কক্ষের প্রতি কোণে এক একটী অর্দ্ধোদ্ভিন্ন (pilaster) স্তম্ভ ছিল। এই সকল কক্ষের ছাদ সুদৃঢ় করিবার জন্যই বোধ হয় এই অর্দ্ধোদ্ভিন্ন স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রকোষ্ঠের ছাদের মাঝখানকার একখানি পাথর [ডি (আই) ১১৭] সারনাথ মিউজিয়মের উত্তরদিকের বারান্দায় প্রদর্শিত আছে। কি উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণের আর দুইদিকের কক্ষগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। সম্ভবতঃ এইগুলি দেবমন্দির ছিল, আর প্রাঙ্গণের দিকে প্রসারিত অলিন্দের কিয়দংশ সম্থাগার রূপে (hall of audience) ব্যবহৃত হইত।

ভিতরের প্রাঙ্গণটী উন্মুক্ত। ইহার মেঝে পাকা ও কাঁকর-চুণ দিয়া মাজা। এই প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে

একটী প্রাচীরবেষ্টিত কূপ (ব্যাস ৫′) আছে। কূপটী মন্দিরের সমসাময়িক, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে যাইবার সোপানশ্রেণীটী পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রধান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাঙ্গণ দুইটী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ১১৪ ও ২৯০ ফিট লম্বা এবং মন্দিরের প্রবেশপথ হইতে দেখা যায়। প্রথম প্রাঙ্গণটার মেঝে বেলে পাথর বাঁধান। তাহার কিয়দংশ যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার উপরে কোনরূপ কারুকার্য্যের চিহ্ন নাই। নক্সায় (চিত্র ১) প্রথম ও দ্বিতীয় তোরণ (First Gateway and Second Gateway) রূপে বর্ণিত ইমারত দুইটী এই প্রাঙ্গণের শোভাবর্দ্ধন করিত। দ্বিতীয় তোরণটী প্রথম তোরণ অপেক্ষা বৃহদাকার এবং প্রত্যেক তোরণের বহির্দেশে প্রতোলী (bastion) ও প্রতিহার গৃহ ছিল। প্রথম তোরণের উত্তরদিকের প্রতোলী ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় তোরণের ভিত্তি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ভূমি হইতে আট ফিট নীচে এই ভিত্তির প্রথমস্তর থাকায় অনুমান হয় যে ইহার উপরে একটী অতি উচ্চ ইমারত ছিল। এখন ইহার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। উভয় তোরণই ধর্ম্মচক্রজিনবিহারের ন্যায় একই উপাদানে এবং একই রীতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আর একটী বৃহত্তর তোরণ এবং

এক বা একাধিক প্রাঙ্গণ আরও পূর্ব্বদিকে ছিল।

সুড়ঙ্গযুক্ত মন্দির

পশ্চিমাংশের সমস্ত জমি ধর্ম্মচক্রজিনবিহারের সীমাভুক্ত। এই দিকে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্ঘারাম ব্যতীত আর একটী ভূগর্ভনিহিত গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে ইহার কতক অংশ বাহির হয় এবং তখন পয়ঃপ্রণালী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দের খননে জানা গেল যে ইহা একটী ক্ষুদ্র ভূমধ্যস্থিত মন্দিরে যাইবার পথ, লম্বায় ১৬০′ ৯″।

এই সুড়ঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতে হয়; ইহার মেঝে খোয়া দিয়া বাঁধান। সিঁড়ির শেষে প্রবেশ পথ, তাহার ছাদটী নীচু। সুড়ঙ্গের কতক অংশ প্রস্তরনির্ম্মিত, বাকিটী ৯″×৭″×১$\frac{৩}{৪}$″ মাপের ইষ্টকনির্ম্মিত। ধর্ম্মচক্রজিনবিহার নির্ম্মাণ কালেও ঠিক এই আকারের ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই সুড়ঙ্গটী ৬′ উচ্চ এবং মোটের উপর ৩$\frac{১}{২}$′ প্রশস্ত। প্রবেশদ্বার হইতে ৮৭ ফিট দূরে পথটী একটী (১২′ ৭″ লম্বা এবং ৬′ ১০″ চওড়া) কক্ষে পরিণত হইয়াছে। উপর হইতে এই কক্ষে নামিবার একটী স্বতন্ত্র সিঁড়ি এবং দুই পার্শ্বে দুইটী দ্বার আছে। প্রাচীর গাত্রে যে সমস্ত কুলঙ্গী আছে তাহাতে বোধ হয় দিবাভাগে সুড়ঙ্গটীর অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রদীপ রাখা হইত। এই সুড়ঙ্গের ছাদ বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত।

মন্দিরটী আকারে সমচতুষ্কোণ, কিন্তু এখন কেবল মাত্র ইহার প্রাচীরের ভিত্তিমূল অবশিষ্ট আছে। আকারে মন্দিরটী পূর্ব্ববর্ণিত বজ্রবারাহী মন্দিরের মত। সম্ভবতঃ এই মন্দিরে কোন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা ভিক্ষুগণের নির্জ্জনে ধ্যান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

মোগল দুর্গে অনেক গুপ্ত পথ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ব্বে নির্ম্মিত এই একটী মাত্র সুড়ঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ গুপ্ত পথ বা সুড়ঙ্গের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে কথিত আছে যে পাণ্ডবগণ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ গুপ্তপথ দিয়া জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মচক্রজিনবিহারে দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি [বি (এফ)৪-৫] ব্যতীত এপর্য্যন্ত কোন দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় ইহারা গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি (যদিও তাঁহাদের বাহন নাই)। এজন্য এই বিহারে কোন্ দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু কুমরদেবীর প্রশস্তি পাঠে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী অনুমান করেন যে ইহা রাজ্ঞী কুমরদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ দেবতা বসুধারার মন্দির। সারনাথে আবিষ্কৃত তিনটী

বসুধারার [বি (এফ) ১৯-২১] মূর্ত্তি এই মন্দিরটীর সমসাময়িক। বর্ণনা অনুসারে বোধ হয় কুমরদেবী যে তাম্রপটে ধর্ম্মচক্রজিনদেবের উপদেশ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন তাহাও সম্ভবতঃ এই মন্দিরে রক্ষিত ছিল।

নিম্নলিখিত কারণে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী মহাশয় এই ইমারতটীকে কুমরদেবীর ধর্ম্মচক্রজিনবিহার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন :—ইহা সঙ্ঘারাম হইতে পারে না কারণ (১) ইহার আকার বিভিন্ন এবং একদিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ; কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘারামগুলি সাধারণতঃ চতুঃশালাজাতীয় অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে কক্ষ পরিবেষ্টিত। (২) বাসোপযোগী স্থান ইহাতে অল্প ; (৩) আর কোন সঙ্ঘারামে এরূপ তোরণবিশিষ্ট বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বা অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় তোরণের দক্ষিণদিকে আবিষ্কৃত কুমরদেবীর শিলালিপিতেও [ডি (এল) ৯] ধর্ম্মচক্রজিনবিহার নামধেয় ইমারত নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ আছে।

এই বিহারটী নির্ম্মাণ করিতে যেরূপ শ্রম ও অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহা কোন বিশিষ্ট ধনী অথবা রাজার কীর্ত্তি। কুমরদেবীর স্বামী মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও তাঁহার অনুরোধে শ্রাবস্তী নগরের জেতবন

সঙ্ঘারামের অধিবাসী বৌদ্ধভিক্ষুগণের উদ্দেশে যে পাঁচখানি নিষ্কর গ্রাম দান করিয়াছিলেন ইহাও রাজ্ঞী কুমরদেবীর বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ। সারনাথে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা তাহারই ফল।

দ্বিতীয় সঙ্ঘারাম।

কুষাণযুগের শেষ ভাগে অথবা গুপ্তযুগের প্রারম্ভে নির্ম্মিত তিনটী সঙ্ঘারামের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্ঘারামটী ধর্ম্মচক্রজিনবিহারের পশ্চিমদিকে ধ্বংসাবশেষের নিম্নের আবিষ্কৃত হয়। ইহার পশ্চিম প্রাচীরই মৃগদাবের পশ্চিম সীমা। ইহার দেওয়ালের বর্ত্তমান উচ্চতা ভিত্তি হইতে তিন বা চার ফিটের অধিক হইবে না এবং স্থানে স্থানে অংশবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই ইমারতের নক্সা কিটো সাহেব কর্ত্তৃক উৎখাত সঙ্ঘারামের অনুরূপ। এ পর্য্যন্ত খননে পশ্চিমদিকে নয়টী কক্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে দুইটী কক্ষের কিয়দংশ, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দালানের অধিকাংশ এবং দক্ষিণাংশের দুইটী ঘর পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের বারান্দায় একটী অস্থায়ী রন্ধনশালা ছিল এবং তাহাতে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত অনুচ্চ বেদী ও ২।৩টী ইষ্টকনির্ম্মিত উনান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মাটির গামলা ও হাঁড়ী ব্যতীত আর কোন তৈজসপাত্র পাওয়া যায় নাই। এই সঙ্ঘারামের আঙ্গিনার মাপ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে

৯০′ ১০″ এবং খননে অবগত হওয়া যায় যে ইহার বহির্ভাগের মাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬৫′ ছিল। পশ্চিম-দিকের ঘরগুলির মধ্যে দক্ষিণদিকের কোণ হইতে ষষ্ঠ কক্ষটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। খনিত অংশে বারান্দার একটীও স্তম্ভ পাওয়া যায় নাই, তবে অনুমান হয় যে সেগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সঙ্ঘারামের স্তম্ভের মতন ছিল। পশ্চিম বারান্দার দেওয়ালের দক্ষিণ অংশের দুইটী স্তম্ভের অধিষ্ঠান (base-stone) পাওয়া গিয়াছে।

সার জন মার্শেল সাহেবের খননে ইহার নিম্নে আর একটী পুরাতন সঙ্ঘারামের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই প্রাচীনতর ইমারতটী কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা কঠিন। ইহার আরও নিম্নে কোন ইমারত আছে কি না তাহাও বলা যায় না।

তৃতীয় সঙ্ঘারাম।

কুমরদেবীনির্ম্মিত মন্দিরের পূর্ব্বদিকে তৃতীয় সঙ্ঘারাম অবস্থিত। সারনাথে আবিষ্কৃত ইমারতের মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। এই ইমারতটী দ্বিতীয় সঙ্ঘারামের অনুরূপ। ইহার দক্ষিণ দিকের চারিটী কক্ষ, পশ্চিম দিকের কক্ষশ্রেণী, ভিতরের প্রাঙ্গন এবং বারান্দার কিয়দংশ বাহির হইয়াছে। পশ্চিম দিকে সাতটী মাত্র কক্ষ থাকায় অনুমান হয় যে একতালায় ২৪টী কক্ষ ছিল। এই দিকের বাহিরের দেওয়াল ১০৯ ফিট ৬ ইঞ্চি

লম্বা। এই সঙ্ঘারামটী বোধ হয় দ্বিতল বা ত্রিতল ছিল, কিন্তু উপরে উঠিবার সিঁড়ি এখনও আবিষ্কার হয় নাই। প্রাচীরগুলি প্রায় ১০ ফিট উচ্চ। পশ্চিম দিকে বাহিরের দেওয়াল ৫½ ফিট এবং দক্ষিণ দিকে ছয় ফিটের অধিক চওড়া। বারান্দাটী প্রায় ১১ ফিট চওড়া এবং ইহার ছাদ প্রাঙ্গণের দিকে প্রস্তরস্তম্ভের উপরে এবং ভিতরদিকে প্রাচীরে সংলগ্ন অর্দ্ধোদ্ভিন্ন স্তম্ভের উপরে স্থাপিত ছিল। এই সমস্ত স্তম্ভ বা অর্দ্ধোদ্ভিন্ন স্তম্ভের শীর্ষভাগ (capital) চতুর্বাহুবিশিষ্ট (bracket-capital)। কুমরদেবী-নির্ম্মিত মন্দিরের প্রাচীর এই ইমারতের পশ্চিমদিকের পঞ্চম কক্ষটার উপর দিয়া গিয়াছে এবং সেটি রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিম্নে একটী নূতন দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে।

প্রকোষ্ঠগুলির দ্বারের উচ্চতা ৬′ ৭″ এবং প্রস্থ ৪′ ২″। কাঠের দরজাগুলি পাওয়া যায় নাই। তৃতীয় নম্বর গৃহের দরজার কপালীটী (lintel) জীর্ণাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানকালে তৎস্থানে নূতন কাঠ দেওয়া হইয়াছে। এই কপালীটীর উপরকার কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ গৃহে গবাক্ষ ছিল এবং তাহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত জাফরি ছিল। এই প্রকার দুইখানি জাফরি [ডি (ঈ)

২ ও ৪] পাওয়া গিয়াছে। কক্ষের ভিতরদিকের ইষ্টক-গুলি মসৃণ নহে। বোধ হয় দেওয়ালে আস্তর (plaster) ছিল, যদিও বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্ন নাই। এই কক্ষের পূর্ব্বদিকের ঘরটী সঙ্ঘারামের প্রবেশ পথ। কুমরদেবীর মন্দিরের প্রথম তোরণটী রক্ষার্থে ইহার পূর্ব্বাংশ খনন করা হয় নাই। দক্ষিণদিকের তৃতীয় কক্ষের পশ্চাতের কক্ষটী ১৭ ফিট পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। এই কক্ষটীর কোন প্রবেশদ্বার না থাকায় মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ ভাণ্ডার অথবা উপরের কোন ঘরের ভিত্তি ছিল।

এই সঙ্ঘারামের আঙ্গিনা, বারান্দা এবং কক্ষের মেঝে পাতফ্লি (laid flat) ইটে গাঁথা। প্রাঙ্গণের জল-নিকাশের জন্য পশ্চিম কোণে একটী পয়ঃপ্রণালী আছে। এই প্রণালীর মুখে একখানি পাথরের ঝাঁঝরি আছে, ১৯২২ সালের খননে জানা যায় যে এই পয়ঃপ্রণালীটী তৃতীয় সংখ্যক সংঘারাম অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে গিয়াছে। এখন ইহার শেষাংশ কুমরদেবীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিম্নে প্রোথিত আছে।

এই প্রাচীন সঙ্ঘারাম হইতে দুইখানি মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত চিত্রফলকের (bas-relief) অংশ ব্যতীত যুগ নির্দ্ধারণোপযোগী আর কোনও বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায়

নাই। ইহা বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভের চিত্রের অংশ। কারুকার্য্য দেখিয়া অনুমান হয় যে উক্ত চিত্রফলকগুলি কুষাণযুগের শেষভাগে খোদিত হইয়াছিল।

চতুর্থ সঙ্ঘারাম।

উপরে উঠিয়া একটু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে প্রথম সঙ্ঘারামের প্রথম তোরণ দৃষ্ট হয়। এখান হইতে আর একটু পূর্ব্ব দিকে জমির ১৫ ফিট নিম্নে চতুর্থ সঙ্ঘারামটী অবস্থিত। ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে এই সঙ্ঘারামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পূর্ব্বদিকস্থ দুইটি কক্ষ এবং পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের বারান্দার কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তারপর উত্তরদিকের চারিটী কক্ষ ব্যতীত আর কিছুই বাহির হয় নাই। এই সঙ্ঘারামের অধিকাংশ কুমরদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ সীমানার প্রাচীরের দক্ষিণদিকে এখনও প্রোথিত রহিয়াছে। ভিতরের আঙ্গিনার চারিদিকের বারান্দার কয়েকটী স্তম্ভ শায়িত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল; এখন সেগুলি পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলি তৃতীয় সঙ্ঘারামের স্তম্ভের অনুরূপ। বারান্দাটী ৭′ ৬″ হইতে ৭′ ১০″ চওড়া। আঙ্গিনার মেঝে ইষ্টক নির্ম্মিত এবং উত্তর-পূর্ব্ব কোণে জলনিকাশের প্রণালীর দিকে কিঞ্চিৎ ঢালু।

এই সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকের কক্ষগুলির পশ্চাদভাগে একটী বৃহদাকার প্রস্তর নির্ম্মিত শৈবমূর্ত্তির পাদপীঠ আছে।

বৌদ্ধ সঙ্ঘারামটীর সহিত এই মূর্ত্তিটীর [বি (এচ) ১; চিত্র ৮ খ] কোনও সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহা আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে উক্ত সঙ্ঘারাম ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। সারনাথের এই অংশে কয়েকটী লৌহনির্ম্মিত তৈজসপাত্র ছাড়া উল্লেখ-যোগ্য আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই তৈজসপাত্রগুলি সঙ্ঘারামের ধ্বংসের সমসাময়িক।

তৎপরে দ্বিতীয় তোরণ হইয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে ধামেক স্তূপের উচ্চ শীর্ষদেশ নয়নপথে পতিত হয়। এই স্তূপের চতুর্দ্দিকে মেজর কিটো সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত অনেকগুলি কক্ষ, স্তূপাদি এখন লুপ্ত হইয়াছে। উত্তরদিকের ইমারতগুলি ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়। ইহাদের নির্ম্মাণকাল গুপ্তযুগের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। এই সকল স্তূপ ও ভজনাগার প্রভৃতি ইষ্টকনির্ম্মিত। খনন চিত্রে এই স্থানের ৭৪ সংখ্যক স্তূপের ভিত্তিটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তবে পরবর্ত্তী কালের আর একটী ইমারতের নিম্নে ইহা এখন প্রোথিত আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধ-রাজ্ঞীর প্রশস্তিখানি [ডি (এল) ৯] এই অঞ্চলেই বাহির হয়। এই লিপির প্রথম দুইটী শ্লোকে বসুধারা এবং

চন্দ্রকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলীর উল্লেখ আছে। একবিংশ শ্লোকে একটী সঙ্ঘারাম নির্ম্মানের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কুমরদেবী এক খানি তাম্রপটে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র খোদিত করাইয়াছিলেন; তিনি অশোক নির্ম্মিত ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তক বুদ্ধ মূর্ত্তিটীর পুনঃসংস্কার করেন। এই শ্লোকগুলির কবি শ্রীকুণ্ডর রচয়িতা এবং এই লিপির শিল্পী বামন। এই প্রশস্তি ব্যতীত এখানে তিনটী বৌদ্ধমূর্ত্তি [বি (সি) ২ ও ৩৫ এবং বি (ডি) ৮] পাওয়া গিয়াছিল। এই মূর্ত্তিগুলি বোধ হয় পুরাকালে ধামেক স্তূপের কুলঙ্গীতে স্থাপিত ছিল।

ধামেক স্তুপ।

সারনাথের স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে ধামেকস্তূপ (চিত্র ৪) বিশেষ প্রসিদ্ধ। "ধামেক" নামটী সংস্কৃত "ধর্ম্মেক্ষা" শব্দের অপভ্রংশ। বর্ত্তমান সময়ে জৈন মন্দিরের পাকা মেঝে হইতে এই স্তূপটীর উচ্চতা ১০৪ ফিট এবং ভিত হইতে ১৪৩ ফিট। ধামেক স্তূপের নিম্নাংশের ব্যাস ৯৩ ফিট এবং তাহা খুব দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত। প্রস্তরখণ্ডগুলি লৌহকীলক দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। স্তূপের নিম্নভাগ প্রস্তর নির্ম্মিত এবং উপরিভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত। পূর্ব্বে উপরাংশের বহিভাগেও প্রস্তর গাঁথনী

ছিল। অনুমান হয় ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহের লোকেরা এই প্রস্তরগুলি লইয়া যায়। স্তূপের নিম্নাংশ হইতে অপসৃত প্রস্তরগুলি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক পুনরায় সংযোজিত হইয়াছে।

স্তূপের ভিত্তিমূলে আটটী মুখ বাহির হইয়া আছে। ইহাতে আটটী কুলঙ্গী ও পাদপীঠ বর্ত্তমান। প্রত্যেক কুলঙ্গীতে এক একটী মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই অংশে প্রাপ্ত তিনটী আসীন মূর্ত্তি [বি (সি) ২ ও ৩৫ এবং বি (ডি) ৮] সম্ভবতঃ এই স্তূপের কুলঙ্গীতে নবম কিম্বা দশম শতাব্দীতে স্থাপিত ছিল। প্রথমটী গৌতমবুদ্ধের সম্বোধির মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন বা সারনাথে প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। অবশিষ্ট পাঁচটী মূর্ত্তি এখনও পাওয়া যায় নাই ; এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত কুলঙ্গীতে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যে সমস্ত প্রাচীন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় নাই।

স্তূপমূলের নিম্নাংশ সুবিস্তৃত নক্সায় পরিপূর্ণ। নক্সা (চিত্র ৯) দেখিয়া বোধ হয় যে স্তূপটী গুপ্তযুগে নির্ম্মিত। ইহাতে ব্যবহৃত ইষ্টকের আকারই তাহার প্রমান। ফার্গুসন সাহেব ইহাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইমারত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ওরটেল সাহেব বলিয়াছেন

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হুয়েঙ-সঙের বারাণসীতে অবস্থান কালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এই স্তূপটী যে পরবর্ত্তী যুগের ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান নাই। ইহার মধ্যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত "যে ধর্ম্ম . . ." মন্ত্রযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৩৫ সালে জেনারল কানিংহাম এই স্তূপের উপর হইতে আন্দাজ ১০ ফিট নীচে এই প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছিলেন। এখন ইহা কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। সম্ভবতঃ স্তূপটীর পুনঃ সংস্কারের সময় ইহা ভিতরে প্রোথিত হইয়াছিল।

স্তূপগাত্রে খোদিত অসম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়া অনুমান হয় যে স্তূপটী সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হয় নাই। এইটী এইস্থানের সর্ব্বপ্রাচীন ইমারত নহে। স্তূপের ভিত্তি হইতে জেনারল কানিংহাম যে বৃহদাকারের ইষ্টক পাইয়াছেন তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমারতে ব্যবহৃত হইত। এই ইষ্টকগুলি তৎকালে নির্ম্মিত আদিম ইমারতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই ইমারতটী কিরূপ ছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সম্রাট অশোক গৌতমবুদ্ধের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ এই স্থানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েঙ-সঙ বোধ হয় বারাণসী

আসিয়া এই স্তূপটী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যে সমস্ত ইমারতের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহার কোনটীর সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই।

পঞ্চম সঙ্ঘারাম।

ধামেক স্তূপের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মেজর কিটো সাহেব পঞ্চম সংখ্যক সঙ্ঘারামটী আবিষ্কার করেন। অনেকগুলি খল ও ডাঁটি প্রাপ্ত হওয়ায় এই ইমারতটীকে তিনি রোগীনিবাস (hospital) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। ইহা একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং ইহার নির্ম্মাণ কাল অষ্টম বা নবম শতাব্দী। ইহার নিম্নে গুপ্ত সময়ের স্থাপত্য চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

জৈন মন্দির।

ধামেক স্তূপের অদূরে আধুনিক যুগে নির্ম্মিত একটী জৈন মন্দির আছে। এই মন্দিরটী প্রাচীর বেষ্টিত এবং ইহার পূর্ব্বদিকের বৃহৎ আঙ্গিনা ধামেক স্তূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী দিগম্বর সম্প্রদায়ের একাদশ তীর্থঙ্কর শ্রীঅংশনাথের উদ্দেশ্যে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়। এখানে কোন প্রত্ন নিদর্শন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

মিউজিয়ম।

মণ্ডপে রক্ষিত জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তি।

জৈন মন্দিরের পশ্চিমে একটী খোলা মণ্ডপ দৃষ্ট হয়। সারনাথে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের জন্য ওরটেল সাহেব ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। এই মূর্ত্তিগুলি এখন নূতন মিউজিয়ম গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান হইতে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মূর্ত্তিসমূহ এখন এই মণ্ডপে রক্ষিত আছে। এ মূর্ত্তিগুলির প্রাপ্তি স্থান মেজর কিটো কর্ত্তৃক সত্তর বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত একখানি চিত্রগ্রন্থ (Volume of Manuscript Drawings) হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী প্রণীত মিউজিয়মের তালিকা গ্রন্থে (Catalogue) এই সমস্ত মূর্ত্তি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটী বিশিষ্ট মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া হইল।

অসম্পূর্ণ যমুনা দেবীর মূর্ত্তিটী (জি ২) বোধ হয় মণ্ডপে প্রদর্শিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ৬′ ৭½″ উচ্চ এবং প্রবেশপথের সম্মুখে রক্ষিত। যমুনা

কচ্ছপের উপরে দণ্ডায়মানা। তাঁহার মুখমণ্ডল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পরিহিত শাটী চরণগ্রন্থি পর্য্যন্ত নামিয়াছে। দেহের উর্দ্ধভাগ অনাবৃত, কিন্তু বর্ত্তুল কর্ণাভরণ, হার, বাজু এবং অন্যান্য অলঙ্কারে পরিশোভিত। দেবী হস্তে পুষ্পমাল্য (?) ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বাম ভাগে একজন উপাসক নতজানু হইয়া অবস্থিত; দক্ষিণে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি চামর ব্যজন করিতেছেন, আর একটু দক্ষিণে আর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দেবীর মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছেন; ছত্রের উপরিভাগ লুপ্ত। পশ্চাতে একটী মস্তকবিহীনা রমণী ডালা হস্তে দণ্ডায়মান। প্রস্তর মূর্ত্তির ঠিক দক্ষিণে একটী পুরুষের পদ এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আকৃতির একটী স্ত্রীলোকের পদ দেখা যায়। পাদপীঠের সম্মুখে কচ্ছপের পিছনে একটী ক্ষুদ্র অনঙ্গ (?) মূর্ত্তি। তাহার দীর্ঘ লাঙ্গুল প্রস্তরখণ্ডের একদিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কারুকার্য্যে শিল্পীর শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা গুপ্ত সময়ের নিদর্শন। গাজীপুর জেলায় ভিট্রী নামক স্থান হইতে এই মূর্ত্তিটী আনীত হয়।

আর একটী প্রস্তরখণ্ডে (জি ৩৩; উচ্চতা ২′ ২″, প্রস্থ ১′ ১১″) শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধ চিত্রিত আছে। এই নিদর্শনটীও গুপ্ত সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রস্তরটীর উপরিভাগে [মস্তকবিহীন] রামচন্দ্র পর্ব্বতোপরি আসীন; তাঁহার বাম হস্তে কার্ম্মুক। পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান পুরুষমূর্ত্তিটী লক্ষ্মণ; সম্মুখের পুরুষমূর্ত্তিটী সুগ্রীব এবং তাহার পশ্চাতে হনুমান। প্রস্তরটীর অবশিষ্টাংশ ব্যাপিয়া মৎস্য, কুম্ভীর, শঙ্খ ইত্যাদি সামুদ্রিক জন্তু এবং বানর জাতীয় যোদ্ধৃগণ অবস্থিত। বানরেরা সেতু নির্ম্মাণের জন্য শিলাখণ্ড বহন করিতেছে।

মধ্যযুগের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে জি ৩৮ সংখ্যক সর্দ্দলটী (দৈর্ঘ্য ৮′ ৩″) বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। ইহা তিনটী অংশে (panel) বিভক্ত। মধ্য অংশে (panel) দেবীশ্রী একখানি আসনে এক চরণের উপর অন্য চরণ স্থাপন করিয়া উপবিষ্টা। তাঁহার চারিটী বাহু। নিম্ন বামহস্তে কমণ্ডলু এবং নিম্ন দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা; উপরের দুই হস্তে পদ্ম এবং তদুপরিস্থিত দুইটী হস্তী দাঁড়াইয়া দেবীর মস্তকে জলবর্ষণ করিতেছে। ফলকের দক্ষিণ প্রান্তে চতুর্ভুজ গণেশের মূর্ত্তি। তাঁহার নিম্ন দক্ষিণহস্তে খড়্গ; নিম্ন বামহস্তে মিষ্টান্নপাত্র এবং উপরের দুই হস্তেই পুষ্প। তৃতীয় অংশে (panel) চতুর্ভুজা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তি বিরাজমানা। দেবী বীণাবাদনরতা। তাঁহার উপরের দক্ষিণ হস্তে একটী পুষ্পকোরক এবং নিম্ন বামহস্তে একখানি পুস্তক। তাঁহার

বাহন হংস নীচে বাম কোণে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই তিনটী অংশের (panel) মধ্যবর্ত্তী নিম্ন অংশ (panel) দুইটীতে নবগ্রহ অঙ্কিত আছে। মন্দিরদ্বারের সদ্দলে এইরূপ নবগ্রহ মূর্ত্তি সচরাচর অঙ্কিত দেখা যায়। কেতুকে রাহুর উপরে বসাইয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখা হইয়াছে। পুরাণানুসারে কেতুর চিহ্ন তাহার কুণ্ডলীকৃত লাঙ্গূল এবং রাহুর মস্তক ও দুই বাহু তাহার সমস্ত শরীরের পরিচায়ক, কেন না এই দুই অঙ্গই অমৃতপানে অমর হইয়াছিল। বাকী অঙ্গগুলি বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ অংশে (panel) সূর্য্যের মূর্ত্তি। তাঁহার দুইটী হস্ত; প্রতি হস্তে একটী পূর্ণবিকসিত পদ্ম। পদদ্বয়ের মধ্যে পত্নী ছায়া অবস্থিতা। তাঁহার বাম হস্তে জলপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা। মধ্যভাগে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি থাকায় ফলকটী যে বিষ্ণু মন্দিরে ছিল তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে।

এই মণ্ডপে প্রদর্শিত জৈন মূর্ত্তির মধ্যে দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটী একটী জৈন চতুর্ম্মুখ (জি ৬১; উচ্চতা ২′ ১০¾″, প্রস্থ ১′ ১″)। রাজপুতানায় এবং মাড়োয়াড়ে ইহার নাম চৌমুহাজী এবং প্রাচীন নাম সর্ব্বতোভদ্রিকা। ইহার চারিদিকে চারিটী জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে:—

১। মহাবীরের [শিরোহীন] নগ্ন দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; উভয় পার্শ্বে এক এক জন জিন আসীন। মহাবীরের চিহ্ন বা লাঞ্ছন সিংহ পাদপীঠে খোদিত আছে।

২। আদিনাথের নগ্ন দণ্ডায়মান মূর্ত্তি; ইঁহার চিহ্ন বৃষ পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে।

৩। শান্তিনাথের নগ্ন মূর্ত্তি; ইঁহার চিহ্ন মৃগ পাদপীঠে বর্ত্তমান

৪। শেষ দিকে অজিতনাথের উলঙ্গ মূর্ত্তি; ইঁহার চিহ্ন হস্তী। পাদপীঠে দুইটী হস্তীর মাঝখানে একটী চক্র বিদ্যমান।

এই চতুর্ম্মুখ প্রস্তরখানি পূর্ব্বে কাশীর কুইন্স কলেজে রক্ষিত ছিল।

দ্বিতীয় জৈন মূর্ত্তিটী (জি ৬২) শ্রীঅংশনাথের নগ্ন মূর্ত্তি (উচ্চতা ১′ ৩$\frac{১}{৪}$″, প্রস্থ ১′ ১″)। দুই পার্শ্বে দুই জন পরিচারক। জিনের মস্তক নাই। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত। ইঁহার পাদপীঠে লাঞ্ছন গণ্ডার খোদিত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটী গুপ্তযুগের। ইহাও কুইন্স কলেজ হইতে আনীত হইয়াছে।

সারনাথ মিউজিয়ম।

প্রাচীন মৃগদাবের উচ্চ ভূমি হইতে কিয়দ্দূরে রাস্তার অপর পার্শ্বে নূতন মিউজিয়ম নয়নগোচর হয়। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য্য আরম্ভ হইবার পরই সার জন মার্শেল সাহেব এই মিউজিয়মটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের স্থাপত্য বিশারদ (Consulting Architect) র‍্যানসাম সাহেব (Mr. James Ransome) প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের আদর্শ লইয়া এই মিউজিয়মের নক্সা প্রস্তুত করেন। বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত ইমারতের অর্দ্ধাংশ মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; অবশিষ্টভাগ প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ করা হইবে। এই নূতন মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন বস্তুনিচয়ের বিস্তৃত বিবরণী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক মিউজিয়মের তত্ত্বাবধারকের নিকট পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ নিদর্শনগুলিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবদ্ধ আছে।

পোড়ামাটি, ইষ্টক ও মৃৎপাত্রাদির নিদর্শন।

এই মিউজিয়মের উত্তরদিকের গৃহে পোড়ামাটির বস্তু (terracotta), ইষ্টক এবং মৃৎপাত্রাদি রক্ষিত আছে। কুমরদেবীর মন্দিরের দ্বিতীয় বহিরাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত প্রকাণ্ড জালা দুইটী এই গৃহের মধ্যস্থলে প্রস্তরপীঠের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই দুইটী জালাতে সম্ভবতঃ জল অথবা গোধূমাদি রাখা হইত। গৃহের প্রবেশদ্বারের

সম্মুখে কাষ্ঠনির্ম্মিত আধারে কয়েকটী অতি প্রাচীন মৃন্ময় ভিক্ষাপাত্র, চণ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত (stucco) মুণ্ড, শাক্যমুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, শ্রাবস্তীনগরে তাঁহার অলৌকিক কার্য্য ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত আছে। এই ঘরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটী ছোট আধারে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মুদ্রাগুলি (seal) রক্ষিত আছে। উল্টা অক্ষরে মুদ্রিত লিপিযুক্ত কয়েকটী মুদ্রার (seal) ছাঁচও ইহার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইবে। কোন কোন মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে সূতার দাগ দেখিয়া অনুমান হয় সেগুলি লিপি বা তাদৃশ কোন দ্রব্যে সংলগ্ন সুতায় বাঁধা থাকিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পত্রাদি মোহর করিবার উপরোক্ত রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায় এবং খোতান, সারনাথ ও অন্যান্য স্থানের খননে রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারী এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। খোতানে (খৃঃ দ্বিতীয় শতকে) কাষ্ঠ ও চর্ম্মে লিখিত লিপিতে শিল সংলগ্ন থাকার নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আধারে রক্ষিত কতকগুলি শিল বোধ হয় যাত্রিগণ কর্ত্তৃক সারনাথের বৌদ্ধমন্দিরে পূজোপহাররূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধভক্তেরা তীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন (souvenir) স্বরূপ এইজাতীয় চিত্র স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইতেন। এফ (ডি) ৪-৮ সংখ্যক শিলগুলি প্রধান মন্দিরে (মূলগন্ধকুটীতে) রক্ষিত ছিল।

এর মন্দিরে পূর্ব্বে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশিষ্ট ফলকগুলিতে "যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা" ইত্যাদি এই বৌদ্ধ মন্ত্রটী লিখিত আছে। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গে (১।২৩।৫) কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ আদৌ সঞ্জয়ের শিষ্য পরিব্রাজক শারীপুত্রকে এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন :—

যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতোহ্যবদৎ
তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাশ্রমণঃ।

"যে সকল পদার্থ হেতু হইতে উৎপন্ন তথাগত তাহাদের হেতু বলিয়াছেন, তাহাদের যে নিরোধ তাহাও তিনি বলিযাছেন।"

দেওয়ালের গাত্রে কুম্ভ, কলস, স্থালী প্রভৃতি বহু প্রকারের মৃন্ময পাত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে।

অশোক স্তম্ভশীর্ষ।

মিউজিয়মের বড় হল্ ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্ত্তি-গুলি সংরক্ষিত আছে। হলে প্রবেশ করিবামাত্রই সর্ব্ব-প্রথমে (এ-১ সংখ্যক) অশোক স্তম্ভ শীর্ষ (চিত্র ৫) দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার উচ্চতা ৭ ফিট, নিম্নাংশ ২ ফিট ও ('bell-shaped') ঘণ্টাকৃতি। ইহার কটিদেশে হস্তী, বৃষ, অশ্ব এবং সিংহ চলন্ত অবস্থায় খোদিত। তিনটী জন্তুর চলনভঙ্গী সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধাবমান অশ্বের চিত্রটীও সুচারুরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

স্তম্ভের উপরিভাগ পরস্পর পৃষ্ঠসংলগ্ন সিংহচতুষ্টয়ে শোভিত। প্রত্যেকটী সিংহ ৩′ ৯″ উচ্চ। এই চারিটী সিংহ মূর্ত্তির মধ্যে দুইটীর মস্তক স্থানচ্যুত হইয়াছিল, এক্ষণে পুনঃসংলগ্ন করা হইয়াছে। স্তম্ভটী কলা নৈপুণ্যে, গাম্ভীর্য্যে ও স্বাভাবিকতায় শুধু মৌর্য্য শিল্পের ন্যায় সমগ্র বিশ্বশিল্পের একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

স্তম্ভশীর্ষের কটিদেশের চারিটী জন্তু উৎকীর্ণ করিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার ব্লকের (Dr. Th. Bloch) মতে এই চারিটী জন্তুর দ্বারা সূর্য্য, দুর্গা, ইন্দ্র এবং শিব এই চারিজন দেবতা সূচিত হইতেছেন এবং ইঁহারা ও অন্যান্য হিন্দুদেবতাগণ যে বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন ইহাও প্রকাশ পাইতেছে। ডাক্তার ভোগেল (Dr. J. Ph. Vogel) বলেন যে এই চারিটী বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত জন্তু, সুতরাং অলঙ্করণ ভিন্ন ইহা অঙ্কনের অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য নাই। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী মহাশয় অনুমান করেন যে এই জন্তুগুলি স্তম্ভশীর্ষের কটিদেশে ‘অনবতপ্ত’’ সরোবরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এই সরোবরে বুদ্ধদেব স্নান করিতেন এবং বুদ্ধদেবের মাতা মহামায়া গর্ভধারণের পূর্ব্বে ইহার জলে স্নান করিয়াছিলেন। এই সরোবরের চারিটী দ্বার, যথাক্রমে পূর্ব্বে সিংহ, উত্তরে

অশ্ব, পশ্চিমে বৃষ এবং দক্ষিণদিকে হস্তীর দ্বারা রক্ষিত হইত। সারনাথের অশোকস্তম্ভ শীর্ষের কটিদেশে এই চারিটী জন্তু দেখিয়া বোধ হয় যে স্তম্ভের উপরে জন্তু-চতুষ্টয় স্ব স্ব দিক অনুসারে স্থাপিত ছিল। লাহোর মিউজিয়মে প্রত্নতত্ত্ববিভাগে একটী ছোট চতুষ্কোণ মৃৎ-বেদিকার উপরে গোলাকার কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের চারিদিকে চারিটী জন্তুর মূর্ত্তি আছে। অশোক স্তম্ভ-শীর্ষের কটিদেশের এই চারিটী জন্তু যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে মৃত্তিকার কুণ্ডটীতেও জন্তুচারিটী ঠিক সেই ভাবে স্থাপিত। রায় বাহাদুর মনে করেন যে মৃত্তিকার কুণ্ডটীও অনবতপ্ত (পালি অনোতত্ত) হ্রদ এবং ইহা পূজার জন্য ব্যবহৃত হইত। সারনাথের অশোক স্তম্ভশীর্ষের কটিতে অঙ্কিত এক একটী জন্তুর পরে এক একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মচক্র খোদিত আছে; কিন্তু লাহোর মিউজিয়মে প্রদর্শিত মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুণ্ডটীতে জন্তুগুলির পরে শঙ্খ, বুদ্ধের চূড়া, ধর্ম্ম-চক্র এবং ত্রিরত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভশীর্ষের উপরে যে চক্র শোভমান ছিল তাহার কয়েক খণ্ড মাত্র ওরটেল সাহেব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেগুলি এক্ষণে স্তম্ভের নিকটেই একটী আধারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কুষাণযুগের বৌদ্ধমূর্ত্তি।

অশোক স্তম্ভশীর্ষের বামপার্শ্বে মথুরার লাল পাথরে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি [বি (এ) ১;

চিত্র ৭]। এই মূর্ত্তিটী সর্ব্বাংশেই জেনারেল কানিংহাম কর্ত্তৃক শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত এবং কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির অনুরূপ। ইহার উচ্চতা ৮′ ১½″ এবং স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিস্থানের বিস্তৃতি ২′ ১০″। দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার যে চারিটী খণ্ড পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া পরিষ্কার বুঝা যায় যে ইহা অভয় মুদ্রার[১] পদ্ধতিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত ছিল। করতলে চক্র এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিতে স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত। বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বাম নিতম্বে স্থাপিত। দেহের নিম্নাংশ একখানি অন্তর-বাসকে আবৃত। বামস্কন্ধে উত্তরীয়; ইহার উভয় প্রান্ত বাম ঊরু পর্য্যন্ত লম্বিত। মূর্ত্তিটীর চিবুক, নাসিকা, ভ্রূ এবং কর্ণলতিকা ভগ্ন ও বিকৃত হইয়াছে। ভিক্ষুদিগের ন্যায় মস্তকটী মুণ্ডিত, উহার মধ্যভাগে একটী গভীর চিহ্ন থাকায় অনুমান হয় যে ঐ স্থানে উষ্ণীষ সংলগ্ন ছিল। পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে সিংহমূর্ত্তি (উচ্চতা ১৪½″); এই মূর্ত্তির মস্তকের উপরে একটী শিলানির্ম্মিত ছত্র ছিল। ছত্রদণ্ডের নিম্নাংশ মূর্ত্তির সন্নিকটে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। অভয়মুদ্রা—ইহাতে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত উন্নমিত এবং কর-তল সম্মুখ দিকে ফিরান। উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান উভয় প্রকার মূর্ত্তিতেই এই মুদ্রা দৃষ্ট হয়

ছত্রের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ; এক্ষণে টুকরাগুলি সংযোজিত করিয়া ছত্রটী গৃহের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে রাখা হইয়াছে। মূর্ত্তিটীতে দুইটী লিপি খোদিত আছে ; একটী পাদপীঠে এবং অপরটী মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে। ছত্রযষ্টিতেও একটী লিপি আছে। এই লিপি হইতে আমরা অবগত হই যে বল নামক একজন মথুরাবাসী বৌদ্ধভিক্ষু এই মূর্ত্তি ও ছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজ্যকালের তৃতীয় বৎসরে কাশীতে বুদ্ধদেবের পাদচারণ (চংক্রমণ) স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। ছত্রযষ্টির লিপি দশপংক্তি বিশিষ্ট এবং 'মিশ্রিত' সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত ঃ—

১। মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২২

২। এতয়ে পুর্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্যবুদ্ধিস্য সদ্ধ্যেবি-

৩। হারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য

৪। বোধিসত্বো ছত্রযষ্টি চ প্রতিষ্ঠাপিতো

৫। বারাণসিয়ে ভগবতো চংকমে সহা মাত(া)

৬। পিতিহি সহা উপদ্ধ্যায়াচেরেহি সদ্ধ্যেবিহারি-

৭। হি অন্তেবাসিকেহি চ সহা বুদ্ধমিত্রয়ে ত্রেপিটক-

৮। য়ে সহা ক্ষত্রপেন বনস্পারেণ খরপল্লা-

৯। নেন চ সহা চ চ[তু]হি পরিষাহি সর্ব্বসত্বনং

১০। হিতসুখার্থং

অনুবাদ।—মহারাজ কণিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশ দিবসে, উক্ত দিনে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধির সহচর ভিক্ষু ত্রিপিটকবিৎ বল কর্ত্তৃক পিতামাতা, উপাধ্যায়, আচার্য্য, সহচরগণ, শিষ্যগণ, ত্রিপিটকবিদা বুদ্ধমিত্রা, ক্ষত্রপ বনস্পর এবং খরপল্লান ও চতুঃপরিষদগণের সমভিব্যাহারে বারাণসীধামে ভগবানের চংক্রমণ স্থানে বোধিসত্ত্ব (মূর্ত্তি) ও যষ্টি সহ ছত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

মূর্ত্তিস্থ লিপি দুইটী ক্ষুদ্র। তন্মধ্যে পাদপীঠের সম্মুখের খোদিত লিপিটী এইরূপ :—

১। ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রৈপিটকস্য বোধিসত্বো প্রতিষ্ঠাপিতো...

২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহা ক্ষত্রপেন বনস্পরেন।

অনুবাদ।—মহাক্ষত্রপ খরপল্লান ও ক্ষত্রপ বনস্পরের সহিত ত্রিপিটকবিৎ ভিক্ষু বল কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

মূর্ত্তির পৃষ্ঠদেশে লিপিটী এইরূপ :—

১। মহারাজস্য কণি[ষ্কস্য] সং ৩ হে ৩ দি ২[২]

২। এতয়ে পূর্বয়ে ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিট[কস্য]

৩। বোধিসত্বো ছত্রযষ্টি চ [প্রতিষ্ঠাপিতো]

অনুবাদ।—মহারাজ কণিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে, হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশ দিবসে, এই দিনে ত্রিপিটকবিৎ ভিক্ষু বল কর্ত্তৃক বোধিসত্ব (মূর্ত্তি) এবং যষ্টিসহ ছত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

অশোক স্তম্ভের ঠিক অপর পার্শ্বে আর একটী দণ্ডায়-মান বৌদ্ধমূর্ত্তি [বি (এ) ২; উচ্চতা ৬′]। ইহা স্থানীয় একজন শিল্পী কর্ত্তৃক মথুরার মূর্ত্তির [বি (এ) ১] অনুকরণে নির্ম্মিত।

গুপ্তযুগের বৌদ্ধমূর্ত্তি।

অশোক স্তম্ভের ঠিক পশ্চাতে পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে সংলগ্ন মূর্ত্তিটী [বি (বি)১৮১] গুপ্তযুগের (খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম (উচ্চতা ৫′ ৩″; চিত্র ৮-ক)। এই মূর্ত্তিটী ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। বুদ্ধদেবের সারনাথে 'ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন' এই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে। বক্ষোপরি ন্যস্ত হস্তদ্বয়ের মুদ্রা ধর্ম্মচক্র মুদ্রা[১] এবং মূর্ত্তিপীঠে খোদিত চক্র এবং

১। ধর্ম্মচক্রমুদ্রা—এই মুদ্রায় হস্তদ্বয় বক্ষের সম্মুখে এরূপ ভাবে ধৃত হয় যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী বামহস্তের তর্জ্জনী অথবা মধ্যমাকে মাত্র স্পর্শ করিয়া থাকে।

মৃগযুগল সম্বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পরিচায়ক। চক্রটী বুদ্ধকথিত আর্য্যসত্যচতুষ্টয় ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিজ্ঞাপক চিহ্ন। পূর্ব্বে সারনাথের নাম ছিল মৃগদাব, মৃগদ্বয়ে এই মৃগদাব সূচিত করিতেছে। চক্রের দক্ষিণে তিনজন এবং বামে দুইজন ভিক্ষু আসীন। ইঁহারাই পঞ্চভদ্রবর্গীয় শিষ্য বুদ্ধের প্রথম উপদেশবাণী শ্রবণের অধিকারী হইয়াছিলেন। বুদ্ধের পরিধানে সাধারণ ভিক্ষুর পরিধেয় বস্ত্র। এই বস্ত্র কেবল সূক্ষ্ম রেখাদ্বারা সূচিত হইতেছে। মূর্ত্তিটীতে সুচারু শিল্পনৈপুণ্য এবং গভীর ধ্যানতন্দ্রী ভাব সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। মস্তকের চতুর্দ্দিকের প্রভামণ্ডলও চিত্তাকর্ষক। মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে এক একটী বিদ্যাধর শোভমান। ইঁহারা ভগবান বুদ্ধের নিমিত্ত পুষ্পোপহার আনয়ন করিতেছেন।

ইহার দক্ষিণ দিকে একটী শিরোহীন বুদ্ধমূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়[১] আসীন [বি (বি) ১৭৫]। পাদপীঠের

১। ভূমিস্পর্শ মুদ্রা—ইহাতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে। শাক্যমুনি মার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজ সুকৃতির সাক্ষ্য প্রদানার্থ পৃথিবী দেবীকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছেন। এই মুদ্রায় বুদ্ধের মার জয়ের অব্যবহিত পরে বোধিলাভ জ্ঞাপিত হইতেছে। আসীন বুদ্ধমূর্ত্তিগুলিতে সাধারণতঃ এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থলে বোধিবৃক্ষের পত্রাবলী মস্তকের উপরিভাগে অঙ্কিত হয়; কোথাও বা বুদ্ধের প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের নিম্নে বসুন্ধরার একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

গহ্বরস্থ সিংহটী বোধ হয় গয়ার সমীপবর্ত্তী উরুবিল্ব বনের নিদর্শন। বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের নিম্নে পৃথিবী দেবী ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বজন্মে শাক্যসিংহ যে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। গর্ত্তটীর অপর পার্শ্বের মূর্ত্তি দুইটী সম্ভবতঃ মার এবং তদীয় কন্যাত্রয়ের অন্যতমা। এই কন্যাগণ বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া নিজেরাই তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে জরাগ্রস্তা বৃদ্ধায় পরিণত হয়। পাদপীঠে খোদিত লিপি হইতে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতার নাম অবগত হওয়া যায়। ইনি বন্ধুগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

মধ্যযুগের শিবমূর্ত্তি।

এই কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অসম্পূর্ণ বৃহৎ শিবমূর্ত্তিটী [বি (এচ) ১] উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৮খ)। অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। ভগবান শিব অসুর নিধনে নিযুক্ত। কাশীধামে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে এই প্রকারের একটী ক্ষুদ্র আকারের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিচয়।

পরবর্ত্তী কক্ষে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ হইতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। শাক্যবংশীয় গৌতমবুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র। গৌতম স্বয়ং তাঁহার

পূর্ব্বতন আরও ছয়জন বুদ্ধের নাম করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পরে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় যে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন একথাও বলিয়া গিয়াছেন। (এই সাতজন বুদ্ধের মধ্যে গৌতম শেষ বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বের ছয়জন বুদ্ধের নাম—বিপশ্যিন, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ। অশোকের সময়ে বৌদ্ধেরা গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী এই ছয়জন বুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, কারণ অশোক নিজে তীর্থযাত্রাকালে কপিলবস্তু নগরের ধ্বংসাবশেষের নিকটে পূর্ব্বতন বুদ্ধ কনকমুনির স্তূপ দর্শন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী শিলাস্তম্ভের লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে সম্রাট অশোক অভিষেকের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে সেই স্তূপটীর আকার দ্বিতীয়বার বর্দ্ধিত করেন এবং তাঁহার রাজ্যের বিংশ বৎসরে সেই স্তূপটী অর্চ্চনা করিয়া সেই স্থানে তিনি একটী শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।[১]

১। The Asoka edict on the Nigali Sagar pillar :—

১। দেবানংপিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদসবসাভিসিতেন

২। বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিযং বঢিতে

৩। ......সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীয়িতে

৪। ......পাপিতে

E. Hultzsch, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. I, *Inscriptions of Asoka*, New Edition, p. 165.

এই যুগে বোধিসত্ত্ব বলিতে গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বাবস্থা এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়কে বুঝাইত। কুষাণ বংশীয় সম্রাট কণিষ্কের রাজ্যকালে মহাযান মত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময় হইতে অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ এবং বোধিসত্ত্বগণের শক্তি তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। তখনও মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের প্রভাব ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ পঞ্চশ্রেণীভুক্ত বলিয়া কল্পিত হইতে থাকেন। এই পঞ্চধারার মূল আদিবুদ্ধ; আদিবুদ্ধ হইতে পাঁচটী ধ্যানিবুদ্ধ ও মানুষী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ধ্যানিবুদ্ধগণ হইতে পাঁচটী বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের নাম—অমিতাভ, অক্ষোভ্য, অমোঘসিদ্ধি, রত্নসম্ভব এবং বৈরোচন। এখন নেপালে প্রত্যেক চৈত্যের চারিদিকে চারিজন ধ্যানিবুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেবল দুই একটী চৈত্যে পাঁচজনের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচজনের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে বৈরোচন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হওয়ায় নেপালে তাঁহার নাম আদিবুদ্ধ। নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের বর্ত্তমান কেন্দ্র স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে স্বয়ম্ভু চৈত্যের চারিদিকে চারিটী বুদ্ধের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। পঞ্চম বুদ্ধ বৈরোচন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় চৈত্যের অণ্ডের (drum)

উপরে বেদিকায় (abacus) তাঁহার চক্ষুত্রয় অঙ্কিত আছে। কলিকাতা মিউজিয়মে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৈত্যে অণ্ডের চারিদিকে পাঁচটী ধ্যানিবুদ্ধের মূর্ত্তি আছে।[১] এই পাঁচটী ধ্যানিবুদ্ধের সিংহাসনের নীচে তাঁহাদের বাহন হস্তী, অশ্ব, ময়ূর প্রভৃতি খোদিত আছে। কিন্তু আর একটীতে চারিটী ধ্যানিবুদ্ধ এবং অণ্ডের উপরে বেদিকায় আদিবুদ্ধ বৈরোচনের চক্ষু অঙ্কিত আছে। এই পাঁচজন ধ্যানিবুদ্ধ তাঁহাদিগের শিষ্য বোধিসত্ত্বের মাথার উপরে অর্থাৎ চূড়ায় বিরাজিত থাকেন। ইঁহাদের পাঁচজনের মূর্ত্তি একই রূপ, কেবল মুদ্রা দেখিয়া প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মুদ্রা পাঁচটী—ভূমিস্পর্শ, ধর্ম্মচক্র, ধ্যান, অভয় ও বরদ। পঞ্চ ধ্যানি-বুদ্ধ, পঞ্চ মানুষীবুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত রূপে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—

ধ্যানিবুদ্ধ	মানুষীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
বৈরোচন	ক্রকুচ্ছন্দ	সমন্তভদ্র
অক্ষোভ্য	কনকমুনি	বজ্রপাণি
রত্ন-সম্ভব	কাশ্যপ	রত্ন-পাণি

(১) *Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum*, Vol. II, 1883, pp. 81-82, No. Br. 14.

অমিতাভ	গৌতম	{ পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর
অমোঘসিদ্ধি	মৈত্রেয়	বিশ্বপাণি

যে সমস্ত বোধিসত্ত্বের মস্তকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানি-বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে সেগুলি লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথের মূর্ত্তি। লোকনাথ বা লোকেশ্বর দুই, চারি, ছয়, আট, দশ, দ্বাদশ ও ষোড়ষ হস্ত সমন্বিত। এইরূপ অক্ষোভ্য মঞ্জুশ্রীর গুরু। মঞ্জুশ্রী বা বাগীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের বিদ্যার দেবতা। তাঁহার অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই একহাতে পদ্মের উপরে একখানি পুস্তক দৃষ্ট হয়। ইহাই মঞ্জুশ্রীর প্রধান চিহ্ন। মঞ্জুশ্রীর শক্তি প্রজ্ঞপারমিতা নাম্নী দেবীর মূর্ত্তিতে এক বা উভয় হস্তে সনালোৎপলের উপর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্জুশ্রীর সমস্ত মূর্ত্তিতেই কিরীটে বা জটায় তাঁহার গুরু ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি থাকা বিধেয়। বোধিসত্ত্বগণের সাধনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীবাদিরাট্ মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ পীতবর্ণ, ব্যাখ্যান বা ধর্ম্মচক্রমুদ্রাধর, বামহস্তে উৎপলধারী, সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং অক্ষোভ্যাক্রান্ত-মৌলি।[১] বজ্রানন্দ মঞ্জুশ্রী অক্ষোভ্যাধিষ্ঠিত জটা-

১। *Etude sur L'iconographie Bouddhique de l'Inde, deuxième partie*, p. 40.

মকুটী[১] ; এইরূপ জম্ভলের মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ রত্ন-সম্ভবের[২] মূর্ত্তি বিরাজ করেন, কিন্তু মতান্তরে জম্ভলের মূর্ত্তিতেও জটার মধ্যে অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি দেওয়া উচিত।[৩]

সারনাথ মিউজিয়মে প্রদর্শিত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিগুলির মধ্যে বি(ডি)১ সংখ্যক অবলোকিতেশ্বর, বি (ডি) ২ সংখ্যক মৈত্রেয় এবং বি (ডি) ৬ সংখ্যক মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি [বি (ডি) ১] একটী পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। জানুদ্বয় এবং গলদেশ এই তিন স্থানে মূর্ত্তিটী ভগ্ন, নাসিকা বিকৃত এবং দক্ষিণ হস্ত লুপ্ত হইয়াছে। বামবাহু বিচ্যুত হইয়াছিল, এক্ষণে পুনঃ সংযোজিত হইয়াছে। "বামে পদ্মধরং" এই রীতি অনুসারে বাম হস্তে একটী সনাল পদ্ম আছে। দক্ষিণ হস্তের একটী ভগ্ন খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, ইহা বরদ মুদ্রায়[৪] অবস্থিত। "বরদং দক্ষিণে" এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই মুদ্রা

১। *Etude sur L'iconographie Bouddhique de l'Inde, deuxième partie*, p. 46.

২। *Ibid*, p. 51.

৩। *Ibid*, p. 53.

৪। বরদমুদ্রা- দক্ষিণ হস্ত নিম্নদিকে প্রসারিত এবং করতল উর্দ্ধাভিমুখে রক্ষিত। এই মুদ্রা মাত্র দণ্ডায়মান মূর্ত্তির সহিত সংসৃষ্ট।

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিগুলির একটী বিশেষত্ব। মূর্ত্তিটী কটিবন্ধ পর্য্যন্ত নগ্ন। নিম্নদেশ বসনে আবৃত। কর্ণে বর্ত্তুল কর্ণাভরণ এবং গলদেশে জপমালা ও মুক্তা-হার যজ্ঞোপবীতের আকারে বক্ষে শোভা পাইতেছে। "বজ্রধর্ম্ম জটান্তঃস্থম্" এই উক্তি অনুসারে অবলোকিতে-শ্বরের জটামুকুটে তাঁহার গুরু ধ্যানিবুদ্ধ বজ্রধর্ম্ম বা অমি-তাভের একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধ্যানমুদ্রায়[১] অবস্থিত। বোধি-সত্ত্বের পাদমূলে দক্ষিণ হস্তের নিম্নে দুইটী শীর্ণকায় প্রেত বিদ্যমান। ভগবান দক্ষিণহস্তনিঃসৃত অমৃতের দ্বারা তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতেছেন। পাদপীঠে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ একটী সংস্কৃত লিপি আছে। লিপিটী এই :—

১। ওঁ দেয়ধর্ম্মোয়ং পরমোপাসক-বিষয়পতি-সুযাত্রস্য

২। যদত্র পুণ্যং তদ্ভবতু সর্ব্বসত্ত্বানামানুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে[২]

অনুবাদ।

এই মূর্ত্তিটী পরমোপাসক ভূস্বামী সুযাত্র কর্ত্তৃক ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইবে সেই পুণ্যের ফলে সর্ব্ব জীবের পরম জ্ঞান লাভ হউক।

১। ধ্যানমুদ্রা—ক্রোড়ে এক হস্তের উপর অন্য হস্ত স্থাপিত। এই মুদ্রা কেবল মাত্র আসীন মূর্ত্তিতেই ব্যবহৃত হয়।

২। *A.S.R.*, pt. II, 1904-5, p. 81, pc. XXXII, 18.

সারনাথে গুপ্তকালের যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে আলোচ্য মূর্ত্তিটী তাহাদের অন্যতম। ইহাতে ভাস্কর যথেষ্ট শিল্প নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই মূর্ত্তিটী আবিষ্কৃত হয়।

বোধিসত্ত্ব বিশ্বপাণির [বি (ডি) ২] দণ্ডায়মান মূর্ত্তি (উচ্চতা ৪′ ৬″, প্রস্থ ২′ ২″); হস্ত পদ পাওয়া যায় নাই। নাসিকা, চিবুক, কর্ণ ভাঙ্গিয়া ঈষৎ বিকৃত হইয়াছে। কটিবন্ধে সংলগ্ন বসনে দেহের অধোভাগ আবৃত। বক্ষোদেশে উত্তরীয় বিলম্বিত। মূর্ত্তির অঙ্গ নিরাভরণ। কেশজাল চূড়াবন্ধে মস্তকের উপরিভাগে গ্রথিত, উভয়পার্শ্বে চূর্ণ কুন্তল গ্রন্থি হইতে শিথিল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিরোদেশে অভয়মুদ্রায় আসীন ধ্যানিবুদ্ধ আমোঘসিদ্ধি ক্ষুদ্রাকারে অঙ্কিত রহিয়াছেন। ইহা হইতে মূর্ত্তিটী যে বোধিসত্ত্ব বিশ্বপাণি তাহা অনুমান করা যায়। এই মূর্ত্তিটী বি (ডি) ১ সংখ্যক অবলোকিতে-শ্বরের মূর্ত্তি অপেক্ষা প্রাচীন এবং কুষাণ যুগের বলিয়া মনে হয়।

পদ্মোপরি দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তি [বি (ডি) ৬], উচ্চতা ৩′ ১০২″, প্রস্থ ১′ ৭২″। দক্ষিণ জানু ভগ্ন। দক্ষিণ হস্ত নাই কিন্তু ইহা যে বরদ মুদ্রায় প্রসারিত

ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। 'বামেনোৎপলং' এই রীতি অনুসারে বাম হস্তে ধৃত উৎপলের সমুদয় বৃন্তটী এখনও বর্ত্তমান। দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত, নিম্নার্দ্ধে বসনের রেখা বাম উরুতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেশজাল জটামুকুটের আকারে গ্রন্থিবদ্ধ। জটামুকুটে মঞ্জুশ্রীর "সিংহাসনস্থং অক্ষোভ্যাক্রান্তমৌলিনং" ধ্যানানুসারে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় নিবেশিত হইয়াছে। দেহ নানা আভরণে ভূষিত। মূর্ত্তির দক্ষিণে পদ্মের উপর ভৃকুটীতারা দণ্ডায়মানা। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা এবং বাম হস্তে কমণ্ডলু। বোধিসত্ত্বের বামে মৃত্যুবঞ্চন তারা; ইহার দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তে নীলপদ্ম। মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে পাদদেশ হইতে কিঞ্চিৎ উপরে সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে 'যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা' এই বৌদ্ধ মন্ত্রটী লিখিত আছে। এই মূর্ত্তিটী ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর চীনদেশে কোয়ান-য়িন (Kwan-yin) নামে এবং জাপানে ক্যান্নন (Kwan-non) অথবা করুণাদেবী নামে পূজিত হন। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের তিরোধানের ৫,০০০ বৎসর পরে কেতুমতী নামক স্থানে

অবলোকিতেশ্বরের পুনরায় আবির্ভূত হইবেন এবং নাগবৃক্ষের নিম্নে সম্বোধি লাভ করিবেন।

বৌদ্ধ মূর্ত্তির মধ্যে ধনপতি কুবের এবং তাঁহার মহিষী হারিতী এই দুই জনের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি [বি (ই) ১] উল্লেখযোগ্য। এই নিদর্শনটী একাদশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়।

কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে শক্তির উপাসনা প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমে যে শক্তি বৌদ্ধ সমাজে পূজিত হইয়াছিলেন তাঁহার নাম তারা। যেমন দুর্গা শাক্তের শিবশক্তি এবং দেবমাতা, সেইরূপ বৌদ্ধতারা অবলোকিতেশ্বরের শক্তি এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মাতৃরূপে পূজিতা। তারার উপাসনা বৌদ্ধগণের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা প্রাচীনতর কোনও সম্প্রদায়ের নিকট হইতে লব্ধ ইহা এখনও গবেষণার বিষয়। তবে প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে তারার সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় এবং পরবর্ত্তী তন্ত্রাদি শাস্ত্রে তারা অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে কীর্ত্তিত হওয়ায় তারা বৌদ্ধ-শক্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 'তারারহস্য বৃত্তিকা' প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থে তারার প্রজ্ঞাপারমিতা এই বৌদ্ধ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও উক্ত অনুমানের সমর্থক। বৌদ্ধ তারা মন্ত্রের ঋষি অক্ষোভ্য। ইনি

ধ্যানিবুদ্ধ এবং ইঁহাতে প্রকাশিত পরমজ্ঞানই প্রজ্ঞা-পারমিতা অথবা তারা। নালন্দায় আবিষ্কৃত একটী তারা মূর্ত্তিতে নিম্নলিখিত তারা মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়—"ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা।[১]" বৌদ্ধসমাজে মহত্তরী বা শ্যামা, খদিরবণী, সিতা, জাঙ্গুলী, ভৃকুটী, বজ্র, রক্ত বা কুরুকুল্লা এবং নীলা তারাই প্রসিদ্ধ।

১। শ্যামা বা মহত্তরী তারা।—শ্যামবর্ণা, দ্বিভুজা, পদ্মচন্দ্রাসনে উপবিষ্টা এবং সর্ব্বাভরণ ভূষিতা। দক্ষিণ করে বরদমুদ্রা এবং বামে সনালপদ্ম।[২] কদাচিৎ ইঁহার পদ্মাসন সিংহোপরি স্থাপিত এবং মুকুটে অমোঘসিদ্ধির মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। অবলোকিতেশ্বরের সহযোগে ইঁহার মূর্ত্তি বামভাগে অঙ্কিত হয়।

২। খদিরবণী তারা।—হরিদ্বর্ণা, মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি বিরাজিত, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বামহস্তে উৎপলধারিণী। দিব্য কুমারী ও সালঙ্কারা। ইঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যথাক্রমে অশোককান্তা মারীচী এবং একজটা মূর্ত্তি অবস্থিতা।[৩]

১। *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, **No.** 20, p. 17, প্রায় অবিকল এই তারা মন্ত্রটী এখনও বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত আছে.

২। *Etude sur L'iconographie Bouddhique de l'Inde, deuxième partie*, p. 64.

৩। *Ibid*, p. 65.

৩। সিতা তারা।—মৃত্যুবঞ্চন তারা ইঁহার নামান্তর। ইনি শ্বেত পদ্ম মধ্যে বদ্ধবজ্র পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্টা, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বাম হস্তে উৎপল, ষোড়শী এবং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে ইনি চতুর্ভূজা। হস্তদ্বয়ে উৎপল বিদ্যমান। দক্ষিণ হস্ত চিন্তামণিরত্ন সম্মুক্ত বরদমুদ্রায় বিন্যস্ত।[১]

৪। জাঙ্গুলী তারা সর্পের দেবী।—শুক্লবর্ণা, চতুর্ভূজা, জটামুকুটিনী, সিতালঙ্কারবতী, শুক্ল সর্পভূষিতা, পর্য্যঙ্কোপরি সত্ত্বাসনে উপবিষ্টা, প্রথম দুই হস্তে বীণাবাদনরতা, দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা এবং দ্বিতীয় বাম হস্তে সিতসর্প।[২]

৫। ভৃকুটী তারা।—একমুখী, চতুর্ভুজা, পীতবর্ণা, ত্রিনেত্রা, নবযৌবনা এবং পদ্মচন্দ্রাসনস্থা। দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং অক্ষসূত্র, বামহস্তে ত্রিদণ্ড কমণ্ডলু, মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভ বিরাজিত।[৩]

৬। বজ্র তারা।—মাতৃমণ্ডলমধ্যস্থা, অষ্টবাহু, চতুর্মুখী, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, কনকবর্ণাভা, কল্যানী, কুমারী পদ্মচন্দ্রাসনস্থা। প্রত্যেক মুখ ত্রিনেত্রসমন্বিত, মস্তকে

১। *Etude sur L'iconpgradhic Bouddhique de l'Inde, deuxième partie*, p. 66.

২। *Ibid*, p. 67. ৩। *Ibid* p. 6

চারিটী ধ্যানিবুদ্ধ বিরাজিত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বজ্র, শর, শঙ্খ ও বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে উৎপল, ধনুক, বজ্রাঙ্কুশ ও বজ্রপাশ।[১]

৭। রক্ততারা বা কুরুকুল্লা।—রক্তবর্ণা, রক্তপদ্মচন্দ্রাসনা, রক্তাম্বরা, রক্তকিরীটবতী ও চতুর্ভূজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা ও শর এবং বামহস্তদ্বয়ে রত্নচাপ ও রক্তোৎপল। দেবী অমিতাভমুকুটী, কুরুকুল্ল গিরিগুহানিবাসিনী, শৃঙ্গাররসোজ্জ্বলা এবং নবযৌবনা।[২]

৮। নীলতারা বা একজটা।—একমুখী, ত্রিনয়না, প্রত্যালীঢ় পদা, ঘোরা, মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতা, খর্ব্বা, লম্বোদরী, নীলপদ্মশোভিতা, ঘোরাট্টহাসশালিনী, শবারূঢ়া, রক্তবর্ত্তুলনেত্রা, নাগাষ্টকবিভূষিতা, নবযৌবনা, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটী, লোলজ্জিহ্বা, দংষ্ট্রোৎকটভীষণা এবং পিঙ্গৈলৈকজটাধারিণী। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও কৃপাণ, বাম হস্তে উৎপল ও নরকপাল, এবং মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি।[৩]

. ভৃকুটী তারা [বি (এফ) ১], উচ্চতা ৩′ ৪″, প্রস্থ ১′ ৩½″। পদদ্বয় এবং দক্ষিণ হস্ত নাই। নাসিকা ও

১। *Etude sur L'iconographie Bouddhique de l'Inde, deuxième partie*, p. 70.

২। *Ibid.* p. 73. ৩। *Ibid*, pp. 75 - 76.

স্তনদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পরিধানে একখানি শাটীর ন্যায় বস্ত্র এবং অঙ্গে নানাবিধ আভরণ। বামহস্তে ত্রিদণ্ডী, কমণ্ডলু, এবং দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা। এই দুইটী লক্ষণ হইতে মূর্ত্তিটী ভৃকুটী তারা বলিয়া অনুমিত হয়।

পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা খদিরবণী তারা মূর্ত্তি [বি (এফ) ২], উচ্চতা ৪′ ৮″। মূর্ত্তিটী কটিদেশে ভগ্ন। নাসিকা ও কর্ণদ্বয় বিকৃত এবং দুই হস্তের অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তবে দক্ষিণ হস্ত যে বরদমুদ্রায় বিন্যস্ত ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং বাম হস্তে ধৃত উৎপলবৃন্তের এক অংশ এখনও বর্ত্তমান। অঙ্গে অলঙ্কার বাহুল্য বিদ্যমান। মস্তকে পঞ্চচূড়াযুক্ত মুকুটের মধ্যভাগে অভয়মুদ্রায় ধ্যানিবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি উপবিষ্ট। তারার দক্ষিণে বৌদ্ধ ঊষাদেবী মারীচী দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্ত্তিটীর মস্তক ও দক্ষিণ হস্ত নাই। বক্ষে বজ্র চিহ্ন এবং বাম হস্তে অশোক পুষ্প ইঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইঁহার বামে লম্বোদরী একজটা। এই সকল লক্ষণ হইতে এই মূর্ত্তিটী খদিরবণী তারা বলিয়া অনুমিত হয়। ললাটের গম্ভীর রেখা তাঁহার ক্রুদ্ধভাব ব্যক্ত করিতেছে। মূর্ত্তিটী ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে ওর্‌টেল্ সাহেব কর্ত্তৃক ধামেক স্তূপের উত্তরে আবিষ্কৃত হয়।

ললিতাসনে উপবিষ্টা শ্যামতারা [বি (এফ) ৭], উচ্চতা ১′ ১০½″, প্রস্থ ১′ ৩½″। একখানি অন্তরবাসক, কাঞ্চী, অঙ্গদ, হার, ইত্যাদি অলঙ্কার তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তে নীলোৎপল। ইঁহার বামদিকে তাঁহারই অনুরূপ বসনভূষণে সজ্জিতা আর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। ইনিও সম্ভবতঃ তারা। নিম্নে একজন উপাসক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। মূর্ত্তিটী মধ্যযুগের শেষভাগের (late-medieval) বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

পূর্ণাঙ্গ বজ্রতারা মূর্ত্তি [বি (এফ) ৮] উচ্চতা ১′ ৭″, প্রস্থ ১′ ৩″। ইনি চতুর্বক্ত্রা এবং অষ্টবাহুসমন্বিতা। দক্ষিণ ও বাম হস্তগুলি ভগ্ন। সম্মুখভাগের ললাটে তৃতীয় নেত্রের চিহ্ন বিদ্যমান এবং চূড়ায় দুইটী অক্ষোভ্যের, একটী অমিতাভের ও একটী বৈরোচনের এবং পশ্চাদ্ভাগের মস্তকে অমোঘসিদ্ধির মূর্ত্তি বিরাজমান। মূর্ত্তিটীর অস্বাভাবিক স্তনভার এবং অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য দেখিয়া মধ্যযুগের বলিয়া অনুমান হয়। ইহা ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বি (এফ) ২৩ সংখ্যক মারীচী মূর্ত্তি। মারীচীর তিনটী মুখ, তাহার মধ্যে একটী বরাহের। তিনি দক্ষিণ পদ বাঁকাইয়া (প্রত্যালীঢ়পদা) দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্ত্তির পাদপীঠে সাতটী শূকর মূর্ত্তি ও সারথির চিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সূর্য্যমূর্ত্তির পাদপীঠে তাঁহার রথের সাতটী অশ্ব ও সারথি অরুণের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। সাধারণতঃ যে সমস্ত মারীচীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অষ্টভুজা, কিন্তু এই মূর্ত্তিটী ষড়্‌ভুজা। কলিকাতা মিউজিয়মেও এইরূপ ষড়্‌ভুজা মারীচী মূর্ত্তি ২।১টী আছে। কালক্রমে মহাযানীয় বৌদ্ধধর্ম্ম মন্ত্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি নানাবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নানা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ইহার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনার মূল বীজমন্ত্র। আমাদের দেশের গুরু বা ইষ্টমন্ত্রপ্রদাতারা যেমন শিষ্য বা শিষ্যাকে দীক্ষা দিবার সময় কর্ণে বীজমন্ত্র শ্রবণ করান সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনাতেও বীজ স্থাপন করিতে হয়। বৌদ্ধদের 'সাধন মালায়' ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

১। অশোককান্তা মারীচী সাধনা।—শূন্যতা ভাবনা করিয়া চন্দ্রে পীতবর্ণ 'মাং', তাহার উপরে অশোক পুষ্পের স্তবক, তাহার উপরে

পুনরায় 'মাং' নামক বীজ এবং সকলের উপরে দ্বিভুজা একমুখী বৈরোচন-মুকুটিনী, ঊর্দ্ধস্থিত অশোকশাখালগ্ন বামকরা দেবীকে ধ্যান করিতে হয়।

২। কল্পোক্ত মারীচী সাধনা।—সূর্য্যে পীতবর্ণ 'মাং' নামক বীজ ধ্যান করিয়া তাহা হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের দ্বারা আকাশে আকর্ষণ করিয়া তাহার উপরে গৌরবর্ণা ত্রিমুখী ত্রিনেত্রা ভগবতীকে স্থাপন করিতে হয়।

৩। উড্ডীয়ান মারীচী সাধনা।—ষণ্মুখী, দ্বাদশ ভুজা, অশোকচৈত্যালঙ্কৃতা, পীতবৈরোচন সমন্বিতা ব্যাঘ্রচর্ম্মবসনা, প্রত্যালীঢ়স্থিতা লম্বোদরী।

মারীচী সাধনাগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রধান ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচন মারীচীর গুরু, 'মাং' তাঁহার বীজ। যেমন শারদীয় পূজার সময়ে পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দেবীর যন্ত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দিয়া বৌদ্ধদেবতাদিগের যন্ত্র আঁকিতে হইত। রক্ত বর্ণের চূর্ণ দিয়া সূর্য্য এবং শ্বেত বর্ণের চূর্ণ দিয়া চন্দ্র আঁকিয়া তাহার উপরে মারীচী দেবীর বীজ 'মাং' অক্ষরটী

পীতবর্ণের চূর্ণ দিয়া আঁকিতে হয়। এই প্রকার তান্ত্রিক সাধনা নেপালে এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রত্যালীঢ়পদা মারীচী [বি (এফ) ২৩], উচ্চতা ১′ ১০″, প্রস্থ ১′ ২‌½′। তাঁহার কটিদেশস্থিত কাঞ্চী হইতে বিলম্বিত বসনে দেহের নিম্নার্দ্ধ আবৃত। দেবী ত্রিমুখী এবং ষড়ভুজা। মধ্যবর্ত্তী মুখটী বৃহত্তম এবং বাম দিকের মুখ বরাহাকৃতি। উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে তীর এবং তৃতীয় দক্ষিণ হস্তে অঙ্কুশ। দ্বিতীয় বাম হস্তটীতে চাপ (ধনুক) এবং সর্ব্বনিম্ন হস্তে তর্জ্জনীমুদ্রা। মধ্যবর্ত্তী মস্তকের মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচনের মূর্ত্তি বিরাজমান। মূলদেশে মারীচীর রথবাহক শূকরশ্রেণী অঙ্কিত। মধ্যস্থ শূকরটী সম্মুখদিকে ফিরিয়া আছে, বাকী ছয়টীর মধ্যে তিনটী দক্ষিণ ও তিনটী বামদিকে ধাবমান। মধ্যবর্ত্তী শূকরে আরূঢ় স্থূলমূর্ত্তিটী নিশ্চয়ই রথের সারথি। রথের অন্য কোন চিহ্ন নাই। মূলদেশের দক্ষিণ প্রান্তে নতজানু পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি সম্ভবতঃ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার পত্নী। মূলের অবশিষ্টাংশে একটী লিপি খোদিত ছিল, সেটী এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটীর সহিত আর তিনটী মারীচীমূর্ত্তি তুলনীয়। ইহাদিগের একটী লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে এবং বাকী দুইটী কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সারনাথের

মারীচীটী ষড়ভুজা, অন্যকয়টী অষ্টভুজা। অন্য মূর্ত্তি-কয়টীতে মধ্যস্থ শূকরের উপরে অথবা নিম্নে একটী রাহুর মস্তক অঙ্কিত আছে এবং প্রধান মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে চারিটী ক্ষুদ্র মারীচী মূর্ত্তি বিরাজিত; কিন্তু সারনাথের মূর্ত্তিতে এসকল চিহ্ন নাই।

অষ্ট মহাস্থানের চিত্র।

প্রস্তরে খোদিত বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনার চিত্র দক্ষিণকক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। সি (এ) ২ এবং সি (এ) ৩ সংখ্যক দুইখানি প্রস্তর ফলকে (stele) চিত্রিত ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধদিগের মতে গৌতম বুদ্ধের জীবনে প্রধান অলৌকিক ঘটনা আটটী। তন্মধ্যে চারিটী ঘটনা এই :—(১) কপিলবস্তু নগরে জন্ম; (২) বুদ্ধগয়া বা মহাবোধিতে সম্যক্ সম্বোধি বা সিদ্ধিলাভ; (৩) সারনাথে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা প্রথম ধর্ম্মপ্রচার; (৪) কুশীনগরে মহাপরিনির্ব্বাণ বা দেহত্যাগ। অপরাপর ঘটনাবলীর মধ্যে এই কয়েকটী চিত্রিত হইয়াছে :—(১) রাজগৃহে বুদ্ধের শত্রু এবং খুল্লতাত পুত্র দেবদত্ত কর্ত্তৃক বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরিত নালগিরি বা রত্নপাল নামক উন্মত্ত হস্তীর বশীকরণ; (২) বৈশালী নগরে মর্কটহ্রদতীরে অথবা কৌশাম্বী নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী পারিলেয়ক বনে একটী বানর কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবকে মধু প্রদান; (৩) শ্রাবস্তীতে সংঘটিত অলৌকিক কীর্ত্তি

মহাপ্রাতীহার্য বা 'Great miracle'; (৪) সাঙ্কাশ্যে দেবাবতরণ অথবা ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সমভিব্যাহারে অবতরণ; (৫) 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' বা বোধি-লাভের নিমিত্ত কপিলবস্তু ত্যাগ। এই ঘটনাবলীর মধ্যে সাধারণতঃ আটটা শিল্পে একযোগে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে ভাবীবুদ্ধ যখন তুষিত স্বর্গে বসিয়া স্থির করিলেন যে তিনি নরলোকের উদ্ধারের জন্য জন্ম গ্রহণ করিবেন তখন কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিলেন যে একটী শ্বেতহস্তী তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। সারনাথের খোদিত চিত্রে [সি (এ) ২] এই ঘটনা অঙ্কিত হইয়াছে; মায়াদেবী শয়ন করিয়া আছেন এবং তাঁহার সন্নিকটে একটা হস্তী প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্বপ্নচিত্রের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী চিত্রে শালবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া মায়াদেবীকে দণ্ডায়মান দেখা যায়। তাঁহার বামপার্শ্বে আর একটা দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি। ইনি মায়াদেবীর ভগ্নী প্রজাপতি। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে একজন পুরুষ একটী শিশুকে ধারণ করিতেছেন। কথিত আছে মায়াদেবী গর্ভাবস্থায় পিত্রালয়ে গমন করিতে-ছিলেন, পথিমধ্যে লুম্বিণী গ্রামের উপবনে তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি এক শালবৃক্ষের তলে দাঁড়া-

ইয়া ছিলেন। সেই সময় গৌতম তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সদ্যোজাত শিশুকে ব্রহ্মা বা ইন্দ্র হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্মচিত্রে, শালবৃক্ষতলে মায়াদেবী, নবজাত বুদ্ধ এবং তৎসহ ইন্দ্র বা ব্রহ্মার মূর্ত্তি প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সি (এ) ২ সংখ্যক ফলকে মায়াদেবীর স্বপ্ন ও বুদ্ধের জন্মচিত্রের মধ্যে আর একটী চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহা বুদ্ধদেবের জন্মের অব্যবহিত পরে প্রথম স্নানের চিত্র। একটী পদ্মের উপর শিশু বুদ্ধ দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ দুইটী দণ্ডায়মান নাগের মূর্ত্তি। কথিত আছে লুম্বিণী গ্রামের উপবনে নাগরাজ নন্দ ও উপনন্দ কর্তৃক রক্ষিত দুইটী প্রস্রবণের জলে গৌতম প্রথম স্নান করিয়াছিলেন। গৌতমের জন্মসংক্রান্ত উল্লিখিত তিনটী ঘটনা এই ফলকের সর্ব্বনিম্নতম অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ফলকের মধ্যবর্ত্তী অংশে তাঁহার গৃহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধু ও পায়স গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। মধ্যের অংশের বাম পার্শ্বে গৌতমের মহাভিনিষ্ক্রমণ চিত্রিত হইয়াছে। গৌতমের অশ্বপাল ছন্দক প্রভুর রাজোচিত আভরণাদি গ্রহণ করিতেছেন। ইহার একপার্শ্বে গৌতমের স্বহস্তে কেশ কর্ত্তনের চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে। কথিত আছে যে গৌতম নিজ চূড়া কর্ত্তন করিলে ইন্দ্র সেই কর্ত্তিত

কেশ স্বর্গে লইয়া গিয়া পূজা করেন। এই অংশের বাম-পার্শ্বে নাগরাজ কালিকের চিত্র বিদ্যমান আছে। এই অংশের দক্ষিণপার্শ্বে গৌতম একটি পদ্মের উপরে ধ্যানস্থ এবং তাঁহার সম্মুখে গ্রামণী দুহিতা সুজাতা পায়সপাত্র হস্তে উপবিষ্টা। কথিত আছে ছয় বৎসর দুষ্করচর্য্যার পর সিদ্ধার্থ সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া সুজাতার প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রহণ করিয়াছিলেন। চড়া কর্ত্তন চিত্রের উপরিভাগে এই পায়স গ্রহণ চিত্র খোদিত আছে। ফলকের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহা দুই ভাগে বিভক্ত। বামে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত সিদ্ধার্থের বোধি বা সিদ্ধি লাভের চিত্র। বুদ্ধের জীবন-চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তপস্যায় কৃশকায় হইয়া গৌতম যখন বুঝিলেন যে এই ভাবে সম্বোধি লাভ করিতে পারিবেন না তখন তিনি ক্রমশঃ উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উরুবেলা বা উরুবিল্ব গ্রামে গৌতম যখন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন তখন মার বুঝিতে পারিল যে গৌতম এইবার সম্বোধি লাভ করিবেন এবং সম্বোধি লাভ করিয়া তিনি লোকের দুঃখ বিমোচন করিবেন। তাহা হইলে জগতে মারের রাজ্য লুপ্ত হইবে। মার তখন নিজের সৈন্য সামন্ত লইয়া সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করিতে চলিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই ফলকের উর্দ্ধদিকে, বাম

প্রান্তে, ধনুক হস্তে দণ্ডায়মান পুরুষটী সম্ভবতঃ মারের মূর্ত্তি। মারকে বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার তিন কন্যা সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করিতে চলিল। গৌতমের মনে কামোদ্দীপনের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বুদ্ধের বাম দিকে দণ্ডায়মানা স্ত্রী মূর্ত্তিটী মারের তিন কন্যার মধ্যে অন্যতমা। মারের কন্যারা বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলে মার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যে বোধি লাভের উপযোগী পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার সাক্ষী কে? বুদ্ধ তখন দক্ষিণ করে ভূমি স্পর্শ করিয়া পৃথ্বীদেবীকে ডাকিলেন। পৃথ্বিদেবী গৌতমের বাক্যের সমর্থন করিলেন। মূর্ত্তির পাদপীঠের মধ্যস্থলে পাত্রহস্তে অঙ্কিত স্ত্রীমূর্ত্তিটী পৃথিবীর মূর্ত্তি।

এই অংশের অপর পার্শ্বে গৌতম বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন সূচিত হইতেছে। গৌতম উরুবিল্ব বা বুদ্ধগয়া হইতে বারাণসী যাত্রা করিয়া নগরের উপকণ্ঠে মৃগদাবে তাঁহার পাঁচজন শিষ্যের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিলে তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন শাক্য-বংশীয় পাঁচজন যুবাকে গৌতমের সহচর হইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু গৌতমের দীর্ঘ তপস্যার অবসানে ইঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে চলিয়া আসেন।

গোতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া কাশীতে প্রথমে এই পাঁচজনের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সূত্রের নাম "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন"। বর্ত্তমান চিত্রে আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের হস্তদ্বয় ধর্ম্মচক্রমুদ্রায় বক্ষের সন্নিকটে বিন্যস্ত রহিয়াছে। শিষ্যপঞ্চকের মধ্যে দুইজন বিদ্যমান আছেন। মূর্ত্তির পাদপীঠের চক্র চিহ্নটী ধর্ম্মচক্র নামে সুপরিচিত। চক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট মৃগদ্বয় মৃগদাবের অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে। এই ফলকের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে সি (এ) ৩ সংখ্যক ফলকে (চিত্র ১০) আটটী ঘটনার চিত্রই সম্পূর্ণ আছে। জন্ম, সম্বোধি ও ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ফলক খানিতে বানর কর্ত্তৃক মধু প্রদান, মহাপ্রাতীহার্য্য, দেবাবতরণ, নালগিরি দমন ও মহাপরিনির্ব্বাণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চারিটী অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশে দুইটী করিয়া চিত্র আছে। নিম্নের অংশে জন্ম ও সম্বোধির চিত্র। ইহার উপরের অংশে বানর কর্ত্তৃক মধু প্রদান ও নালগিরির চিত্র। জন্মচিত্রের উপরে বানর কর্ত্তৃক মধু প্রদানের চিত্রটী অঙ্কিত আছে। কথিত আছে যে বৈশালী নগরের মর্কট হ্রদতীরে বুদ্ধদেবকে একটী বানর মধুপূর্ণ একটী পাত্র প্রদান করিয়াছিল। বুদ্ধদেব বানরের নিকট হইতে মধুপাত্র গ্রহণ করায় বানরটী

আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে একটী কূপে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে। মধু প্রদানের পুণ্যে এই বানর স্বর্গে দেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র দেবদত্ত বুদ্ধের প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। তিনি হিংসাপরবশ হইয়া দুই তিনবার বুদ্ধকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। বুদ্ধ একদিন রাজগৃহের একটী সঙ্কীর্ণপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেবদত্ত একটী মত্ত হস্তীকে সেই সঙ্কীর্ণ পথে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই হস্তীটীর নাম নালগিরি বা রত্নপাল। নালগিরি উন্মত্ত হইলেও বুদ্ধকে আক্রমণ না করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনত হইয়াছিল। এই ঘটনার নাম নালগিরি দমন। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট হস্তী এবং বামপার্শ্বে দেবদত্ত দাঁড়াইয়া আছেন।

তৃতীয় অংশে দেবাবতরণ ও মহাপ্রাতীহার্য্যের চিত্র। বুদ্ধের মাতা মায়াদেবী পুত্রের জন্মের সপ্তাহ পরে স্বর্গ গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের স্বর্গে গমন করিয়া তিনমাস কাল মাতার নিকট অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। কথিত আছে বুদ্ধ যখন ত্রয়স্ত্রিংশগণের স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন তখন স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সহসা তিনটী সোপান আবির্ভূত হয়। মধ্যের সোপানটী স্ফটিক নির্ম্মিত; ভগবান বুদ্ধ এতদ্দ্বারা

অবতরণ করেন। দক্ষিণের সোপানটী সুবর্ণ নির্ম্মিত; ব্রহ্মা বুদ্ধকে চামর ব্যজন করিতে করিতে এই সোপান পথে অবতরণ করেন। বামের সোপানটী রজত নির্ম্মিত; দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া এই পথে আসেন। এই ঘটনার নাম দেবাবতরণ। বৌদ্ধ মতে সাঙ্কাস্য নগরে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা সমভিব্যাহারে বুদ্ধদেব ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন। এই অংশের অপর চিত্রটী 'মহাপ্রাতীহার্য্যের' চিত্র। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহে করণ্ডবেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন পুরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশালীপুত্র, সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র, অজিতকেশকম্বল, ককুদ কাত্যায়ন এবং নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বুদ্ধকে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। মগধের রাজা শ্রেণিক বিম্বিসার এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হইতে স্বীকৃত না হওয়ায় এই ছয়জন আচার্য্য কোশলদেশে গমন করিয়া রাজা প্রসেনজিৎকে মধ্যস্থ হইতে অনুরোধ করেন। প্রসেনজিত স্বীকৃত হইলে বুদ্ধ কোশলদেশের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে গিয়া প্রাতীহার্য্য বা অলৌকিক সৃষ্টি দেখাইয়া এই ছয়জন বিরুদ্ধবাদী আচার্য্যকে পরাস্ত করেন। একাধারে জল ও অগ্নি থাকিতে পারে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বুদ্ধ নিজের স্কন্ধ হইতে অগ্নি ও পদ হইতে জল বাহির করিয়াছিলেন,

এবং একই সময়ে তিনি সর্ব্বত্র সকল দিকে বিরাজমান ইহা দেখাইবার জন্য বহু বুদ্ধ সৃষ্টি করিয়া একই সময়ে চারিদিকে প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই ফলক খানিতে তিনজন বুদ্ধ তিনদিকে তিনটী পদ্মের উপরে বসিয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সি (এ) ৬ সংখ্যক ফলকখানি এই ঘটনার চিত্র। এই ঘটনার নাম মহাপ্রাতীহার্য্য এবং ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিব্যাবদান গ্রন্থে প্রাতীহার্য্য সূত্র নামক দ্বাদশাবদানে লিপিবদ্ধ আছে।[১]

মল্লগণের রাজধানী পাবা নগরে এক গৃহস্থের গৃহে শাকভোজনের ফলে বুদ্ধদেব অশীতি বৎসর বয়সে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় তিনি কুশী নগরের মল্লদিগের অপর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই কুশী নগরের প্রান্তে দুইটী শালবৃক্ষের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্র তখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন। দুইটী বৃক্ষের মধ্যস্থলে শয়ান্ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে ইহা বুদ্ধের মৃত্যু বা মহাপরিনির্ব্বাণের চিত্র।

১। *Divyavadana* edited by E. B. Cowell & R. A. Neil, Cambridge, 1886, pp. 143-66. Monsieur A. Foucher মহাপ্রাতীহার্য্য বা শ্রাবস্তীর এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণের অর্থ সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। *Journal Asiatique, deuxieme serie, Tome XIII,* pp. 1-77, pl. 1-7. ফুসেসাহেবের *Beginnings of Buddhist Art* গ্রন্থে (pp. 147-84 and plates) মহাপ্রাতীহার্য্যের বিশদ বর্ণনা আছে।

ক্ষান্তিবাদী জাতক।

বাহিরের বারান্দায় প্রদর্শিত ডি (ডি) ১ সংখ্যক সর্দ্দলটী (দৈর্ঘ্যে ১৬´) গুপ্ত সময়ের নিদর্শন। ইহার সম্মুখভাগ ছয়টী অংশে (panel) বিভক্ত। দুই প্রান্তের দুই অংশে বৌদ্ধ বৈশ্রবণের মূর্ত্তি অঙ্কিত। বাকী চারিটী অংশে 'জাতক' বা বুদ্ধদেবের এক অতীত জন্মের বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। মধ্যস্থ দুইটী অংশে নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত দেখান হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে নর্ত্তকীরা এক সাধুকে ঘিরিয়া আছে এবং বামে ঘাতক সাধুর দক্ষিণ বাহু ছেদন করিতেছে। এখানে চিত্রিত জাতকের নাম 'ক্ষান্তিবাদী' জাতক। এই জাতকে কথিত হইয়াছে একদা বোধিসত্ত্ব কুণ্ডককুমার নামক ব্রাহ্মণপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। নশ্বর দেহের কথা ভাবিয়া তিনি ঐশ্বর্য্যে বিতৃষ্ণ হইলেন এবং সৎপাত্রে সমস্ত ধন বিতরণ করিয়া হিমালয়ে গিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। দীর্ঘকাল তপঃসাধন করিয়া পুনরায় লোকালয়ে ফিরিলেন এবং বারাণসী নগরে আসিয়া রাজার উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন কাশীরাজ কলাবু মদমত্ত অবস্থায় নর্ত্তকীদল পরিবেষ্টিত হইয়া এই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের নৃত্যগীতে বিমুগ্ধ হইয়া অচিরাৎ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। তখন নর্ত্তকীরা রাজাকে ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে

করিতে বোধিসত্ত্বের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মকথা শুনিবার বাসনা জানাইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া উপ-দেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে নিদ্রাভঙ্গের পর রাজা নর্ত্তকীদের অনুপস্থিতির কারণ শুনিয়া রোষভরে বোধিসত্ত্বের নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে কপট সন্ন্যাসী ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তিতিক্ষা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি।" "তোমার তিতিক্ষা আমি পরীক্ষা করিব" বলিয়া রাজা ঘাতককে বেত্রাঘাতে বোধিসত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইলে রাজা পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন ধর্ম্ম প্রচার কর?" বোধিসত্ত্ব অটলভাবে উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি তিতিক্ষা ধর্ম্ম প্রচার করি।" উত্তর শুনিয়া রাজা ঘাতককে আদেশ দিলেন, "এই ভণ্ড সাধুর হস্তপদ ছেদন করিয়া দাও।" তখনও রাজার প্রশ্নোত্তরে বোধিসত্ত্ব তিতিক্ষা ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিলেন। অতঃপর রাজাজ্ঞায় তাঁহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দেওয়া হইল। রক্তধারায় প্লাবিত হইয়া বোধিসত্ত্ব পুনরায় তিতিক্ষার জয় গাহিলেন। রাজা চলিয়া

গেলেন কিন্তু তাঁহাকে আর প্রাসাদে পৌঁছিতে হইল না। উদ্যানদ্বারের সম্মুখীন হইলে অকস্মাৎ বসুন্ধরা দ্বিধা হইল এবং সেই গহ্বর হইতে এক লেলিহমান অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিয়া মহানরক আবীচিতে নিক্ষেপ করিল। সেই রাত্রেই বোধিসত্ত্বও দেহত্যাগ করিলেন এবং রাজভৃত্য ও নগরবাসীরা গন্ধমাল্যাদির দ্বারা তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পাদন করিল।[১]

১। *The Jataka*, edited by E. B. Cawell, Cambridge, 1897, Vol. III, pp. 26-29.

পঞ্চম অধ্যায়।

শিল্প।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত বিবরণে পাঠক অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন যে সারনাথে অশোকের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান অভ্যুদয় পর্য্যন্ত সকল ঐতিহাসিক যুগেরই শিল্প নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পকলার ধারাবাহিক ইতিহাসের এমন প্রচুর উপকরণ একত্র আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সারনাথের শিল্প সম্পদের মহিমা বুঝিতে হইলে ভারতের শিল্পের ইতিহাস পূর্ব্বাপর আলোচনা করা আবশ্যক। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের সূচনার যুগ মৌর্য্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল। ইহাতে পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে মৌর্য্যদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শিল্পের অনুশীলন ছিল না। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের খুব অল্প শিল্প নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহে আবিষ্কৃত 'জরাসন্ধের বৈঠক' ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া ফার্গুসন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশে হরপ্পায় এবং

সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোডারোতে প্রাচীনতর যুগের (অন্যূন খৃঃ পূঃ ৩০০০) শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফার্গুসন সাহেব অনুমান করেন মৌর্য্যদিগের পূর্ব্বে ভারতীয় স্থাপত্যে প্রস্তরের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং এই নিমিত্তই তাহার কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নাই। আর্য্যগণ কাষ্ঠের উপর নানা প্রকার কারুকার্য্য করিতেন। উপরোক্ত আবিষ্কারের ফলে এখন দেখা যাইতেছে যে এইরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বে ভারতীয় স্থাপত্যে বহুল পরিমাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ দারু স্থাপত্যের প্রভাব শুঙ্গ রাজত্বকাল পর্য্যন্ত প্রস্তরস্থাপত্যে সংক্রামিত দেখা যায়। কিন্তু কাষ্ঠই যে তখন নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান ছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদির বহু ধ্বংশাবশেষ হরপ্পায় ও মহেঞ্জোডারোতে আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

মৌর্য্য শিল্প১

সারনাথের স্থাপত্যের ইতিহাস মৌর্য্যযুগ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। অশোকের অনুশাসনযুক্ত একটী

---

(১) *Cambridge History of India,* প্রথম খণ্ডে সার জন মার্শেলের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে প্রাচীন ভারত শিল্প সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে মৌর্য্য শিল্পের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

স্তম্ভ এবং সম্ভবতঃ তৎকালে নির্ম্মিত একটী প্রস্তর-বেদিকা (railing) তদানীন্তন শিল্পের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১৯১৫ সালের খনন কার্য্যে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রস্তরমুণ্ডেও বজ্রলেপ লক্ষিত হয়। কারুকার্য্য হিসাবে এই মুণ্ডগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে পাটনা হইতে আনীত দুইটা যক্ষমূর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই প্রকার মসৃণ ও চাকচিক্যময় বজ্রলেপ (polish) এই যুগের শিল্প নিদর্শনের একটী প্রধান বিশেষত্ব। পরবর্ত্তী যুগের শিল্পে ঠিক এই প্রকারের বজ্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বজ্রলেপ উক্ত স্তম্ভে ও বেদিকায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

অশোক স্তম্ভটী ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। এইরূপ স্তম্ভ আরও অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক লাট নামে আখ্যাত। এই স্তম্ভগুলি বৃহদাকার এক একটী অখণ্ড (monolithic) প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। এই স্তম্ভগুলি মূল হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত গোলাকারে উঠিয়া শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু ভাব ধারণ করিয়াছে। স্তম্ভের শীর্ষভাগের মূল ঘণ্টাকার (bell-shaped)। ঘণ্টাকৃতি মূলের গ্রীবাদেশে (abacus) নানা প্রকার জীব জন্তুর

মূর্ত্তি খোদিত আছে। পাদমূল (base) হইতে শীর্ষদেশ (summit) পর্য্যন্ত এই স্তম্ভগুলির উচ্চতা ৪০ হইতে ৫০ ফিট। লোরিয়নন্দন গড়ে অবস্থিত স্তম্ভশীর্ষে একটী সিংহমূর্ত্তি এবং উহার গ্রীবাদেশে (abacus) সুশোভন হংসশ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে। অপর স্তম্ভ-গুলির চূড়ায় হস্তী কিম্বা বৃষের মূর্ত্তি আছে। সাঁচীর ও সারনাথের স্তম্ভশীর্ষে একটী সিংহের পরিবর্ত্তে চারিটী সিংহমূর্ত্তি পরস্পরের পৃষ্ঠ সংলগ্ন আছে। গ্রীবাদেশ (abacus) মাঝে মাঝে তরুলতা (honey-suckle) অথবা চক্র বা জন্তু সমূহে পরিশোভিত। স্তম্ভগুলির গায়ে কোনও কারুকার্য্য নাই, কেবল এক প্রকার মসৃণ বজ্রলেপে মণ্ডিত; কিন্তু তাহাতেই ইহাদের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারনাথের স্তম্ভশীর্ষ দেখিয়া স্থির প্রতীতি জন্মে যে মৌর্য্যযুগে ভারতীয় শিল্প অতি উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছিল। এই ভাস্কর্য্য কল্পনায় শিল্পীর বংশানুক্রমে লব্ধ সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বহুযুগব্যাপী সাধনা ভিন্ন এরূপ ভাস্কর্য্যের বিকাশ সম্ভব নহে। শীর্ষস্থ সিংহগুলির অসামান্য তেজোদৃপ্তী তাহাদের স্ফীত শিরানিচয়ে ও মাংশপেশীর নতোন্নত আকারে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহেও এইরূপ জীবন্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। শিল্পের প্রাথমিক

অবস্থার আড়ষ্টভাবের লেশ মাত্র ইহাতে নাই। জন্তুগুলির গড়ন এরূপ স্বাভাবিক হইয়াছে যেন জীবন্ত বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের সজীব ভাব ফুটাইয়া তুলিতে ভাস্করের যে বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু চারিটা সিংহ মূর্ত্তিতে ভাস্কর জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাপূর্ব্বকই স্থাপত্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে এই মূর্ত্তিগুলি স্তম্ভের সকল অংশের সহিত বেশ সুসঙ্গত হইয়াছে (চিত্র ৫)। স্তম্ভের গ্রীবাদেশে (abacus) উৎকীর্ণ অশ্বমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়েও ভাস্কর এমন একটী আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন যাহা প্রতীচ্য শিল্পে সুপরিচিত পদ্ধতির অনুগত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রস্তর গাত্রে খোদিত (relief) মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়েও শিল্পীর সুদক্ষতা সমভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন পারসীক সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপলিসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হখিমনীয় (একিমনীয়) নৃপতিগণের আমলের যে সকল স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত অশোকের স্তম্ভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং এই সকল স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অশোক সম্ভবতঃ পারস্যবাসী গ্রীক শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন। আবার অনেকে মৌর্য্য শিল্পে

বৈদেশিক প্রভাব স্বীকার করিতে অসম্মত। অশোকের নিকট পারসীক বা গ্রীকগণ বিদেশী ছিলেন না। অশোক ধর্ম্মের দ্বারা পারস্য প্রভৃতি দেশ জয় (ধর্ম্মবিজয়) করিয়াছিলেন। সুতরাং অশোকের পক্ষে পারসীক বা গ্রীক শিল্পী বিনিয়োগ অসম্ভব নহে।

শুঙ্গ শিল্প।

মৌর্য্য শিল্পের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শুঙ্গ শিল্পের নিদর্শন সারনাথে দুই চারিটী মাত্র আছে। ছয় নম্বর চিত্রে প্রদর্শিত স্তম্ভশীর্ষটীতে দেখা যায় হস্তী ও অশ্ব লতাপাতার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভশীর্ষের একদিকে অশ্বারোহী, অপরদিকে মাহুত ও একজন আরোহীসহহস্তী। অশ্ব ও হস্তী উভয়েরই গতিশীলতা দেখান হইয়াছে। শুঙ্গযুগের শিল্পকে ভারতের তদানীন্তন জাতীয় শিল্প বলা যাইতে পারে। ভারহুত, বুদ্ধগয়া এবং সাঁচীর দ্বিতীয় স্তূপবেদিকা গাত্রে, পাটনায় এবং সারনাথে প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষে এই শিল্পের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। সাঁচীর দ্বিতীয় স্তূপের বেদিকার পদ্মগুলি এবং ভারহুত স্তূপের বেদিকার গাত্রের লতা এই জাতীয় শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতীয় ভাস্কর এযুগে অবিকৃতভাবে মনুষ্যমূর্ত্তি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। স্তম্ভ গাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলে ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি হয়। মূর্ত্তিগুলিতে কমনীয় ভাব নাই,

যেন প্রস্তর গাত্রে কোন মনুষ্য মূর্ত্তির ছায়া মাত্র পতিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি প্রত্যক্ষ মানবাকৃতির প্রতিকৃতি নহে। যে ছায়া দর্শকের চিত্রপটে বিদ্যমান থাকিয়া যায় (memory picture) এই সকল মূর্ত্তি তাহারই অনুরূপ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। স্থানে স্থানে মূর্ত্তির কোনও কোনও অঙ্গে অতিশয়তা দোষ লক্ষিত হয়। তথাপি বহু মূর্ত্তিবিশিষ্ট চিত্র সমূহে মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বভাবসঙ্গত না হইলেও শিল্পীর অভিপ্রেত ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারহুত, বুদ্ধগয়া এবং সাঁচীর তোরণ গাত্রে খোদিত চিত্রগুলি দেখিলে ইহা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। ভারহুত অপেক্ষা বুদ্ধগয়ার শিল্পকলা এবং বুদ্ধগয়া অপেক্ষা সাঁচীর প্রথম স্তূপের তোরণের ভাস্কর্য্য উৎকৃষ্টতর। এই যুগে ভারতীয় শিল্পে অবাস্তব জীবজন্তু অঙ্কনের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মনুষ্যমূর্ত্তি চিত্রনে শিল্পী সিদ্ধহস্ত না হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ফল ও ফুলগুলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। ফল ফুল ও লতাপাতার মধ্যে কাল্পনিক জীব জন্তুর সুন্দর সমাবেশ করিয়া সাঁচার দ্বিতীয় স্তূপের বেদিকার গাত্রে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে তাহা সেই সময়কার অন্য দেশের শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভাজাত। সারনাথে

প্রাপ্ত স্তম্ভশীর্ষের অশ্বের চিত্রের (চিত্র ৬-ক) সহিত অশোক স্তম্ভের অশ্বের তুলনা করিলে বুঝা যায় শুঙ্গ শিল্পের ধারা বিভিন্ন পথে চলিয়াছিল। এই যুগের শিল্প খুব উন্নত হইলেও ইহাতে গুপ্তশিল্পের লালিত্যের অভাব অনুভূত হয়।

মথুরার প্রাচীন শিল্প।

খৃস্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীব প্রারম্ভে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারে গান্ধারাদি প্রদেশে ব্যাক্ট্রিয়া হইতে আগত গ্রীকগণের অধিকার কালে এক নূতন শিল্প পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহাকে গান্ধার শিল্প পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। ইহা তদানীন্তন গ্রীকশিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত। সারনাথের সহিত এই গান্ধার শিল্পের পরোক্ষ ভাবে সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। প্রাচ্য ও মধ্য ভারতের শিল্পীরা প্রথমতঃ বুদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধ শ্রমণের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন না। গান্ধারের গ্রীক শিল্পীরা গ্রীক দেবমূর্ত্তির অনুকরণে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মান করিতে আরম্ভ করেন। এই গান্ধার শিল্পের সর্ব্বগ্রাসী শক্তি সমগ্র প্রাচ্য শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কুষাণদিগের প্রভাবে গান্ধার শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করে। মথুরা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে ভারতের জাতীয় শিল্পের ও গান্ধার শিল্পের মিলনে এক নূতন শিল্পরীতির উৎপত্তি হয়। এই নূতন রচনারীতি মথুরা শিল্পরীতি নামে বিখ্যাত।

সারনাথে কুষাণযুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন বিরাট বোধিসত্ত্ব [বি (এ) ১] মূর্ত্তি (চিত্র ৭)। এই মূর্ত্তিটী মথুরা অঞ্চল হইতে আনীত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ভিক্ষু বল সম্ভবতঃ মথুরাবাসী ছিলেন। তজ্জন্য বোধ হয় এই মূর্ত্তিটী মথুরার পাথরে নির্ম্মিত। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় যে এক শিল্পিগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, বোধ হয় এই মূর্ত্তিটী তাঁহাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত। ক্ষত্রপ-কুষাণযুগের ভাস্কর্য্য সাঁচী ও ভারহুতের জাতীয় শিল্পরীতির একটী শাখা মাত্র; কিন্তু মথুরায় সমসাময়িক গান্ধার শিল্পের প্রভাব অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্যই সাঁচী, ভারহুত ও বুদ্ধগয়ার শিল্পে ও ভাস্কর্য্যে যে সজীবতা লক্ষিত হয় মথুরার কুষাণযুগের শিল্পে তাহা দেখা যায় না। এই সজীবতার অভাবের কারণ কি? ইহার কারণ বৈদেশিক প্রভাবের আতিশয্য। মথুরার শিল্পে ভারতের জাতীয় শিল্পের ভাবটী বৈদেশিক প্রভাবের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে। বৈদেশিক প্রভাব এত অধিক যে জাতীয় শিল্পরীতি তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছে। অপরদিকে তৎকালে বৈদেশিক ভাস্কর্য্যের প্রভাব এত শক্তিশালী ছিল না যে গান্ধার শিল্পের ন্যায় মথুরা শিল্প চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। ইহা পাশ্চাত্য শিল্প প্রভাব দ্বারা সঞ্জীবিত না হইয়া নিস্তেজ ও প্রভাহীন

হইয়া পড়িয়াছিল। সারনাথের কুষাণ শিল্পের নির্জ্জীব-তার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্প পদ্ধতির অসঙ্গত মিশ্রণের ফলই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সারনাথে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি (চিত্র ৭) দেখিয়া বেশ মনে হয় ইহা প্রস্তর মাত্র, ইহাতে প্রাণ নাই। গুপ্তযুগের মূর্ত্তি দেখিলে যেমন প্রাণে সহজে ভক্তি ভাবের উদয় হয়, কুষাণযুগের মূর্ত্তি দেখিলে তেমন হয় না।

গুপ্ত শিল্প।

সারনাথে ধামেক স্তূপটী গুপ্তযুগের একটী মহান স্থাপত্য নিদর্শন (চিত্র ৪)। ইহার আট শত বৎসর পূর্ব্বে ফিনিয়াসের যুগে গ্রীসদেশে এবং এক হাজার বৎসর পরে মাইকেল এঞ্জেলোর যুগে ইটালীতে ভাস্কর্য্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুপ্তযুগে ভারতবাসিগণের চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা এরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের কার্য্য-কুশলতা এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে তেমন এ পর্য্যন্ত আর ঘটে নাই। যে সকল কারণে জাতীয় জীবনের এমন উৎকর্ষ সাধিত হয় সে কারণগুলি আমরা নিশ্চিত-রূপে অবগত নহি। গ্রীস ও ইতালীতে তদনুরূপ উৎকর্ষের কারণগুলিও আমরা বিদিত নহি। অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত মিলন এবং ভাবের আদান প্রদান ইহার কারণ হইতে পারে। সেই সময়ে পারস্যের

সাসানীয় (Sassanid) সাম্রাজ্য এবং চীন ও রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। বৈদেশিক জাতির আক্রমণ এবং তদ্বারা দেশের উপর যে দুঃখ দুর্দ্দশার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা পরোক্ষ ভাবে এই জাতীয় উৎকর্ষের কারণ হইতে পারে। কেননা এতদপূর্ব্বে কুষাণ, পহ্লব ও শকজাতীয় রাজা-দিগের অধীনতায় ভারতবর্ষকে বহুদিন পর্য্যন্ত নানা অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এই জাতীয় জাগরণের ফল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। এরূপ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা শুঙ্গাধিকারের পর লুপ্ত হইয়া গিয়'-ছিল। এই রাষ্ট্রীয় জাগরণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। দক্ষিণে নর্ম্মদা সীমান্ত লইয়া প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষই এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। এই সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল দুই শত বৎসর। এই দীর্ঘ-কালের পর শ্বেত হুণ জাতীয় আক্রমণকারীর হস্তে এই সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।

ধর্ম্মজীবনে এই জাগরণ ব্রাহ্মণত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠারূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য এই সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমর নাটক ও কাব্যগুলি লিখিয়া-

ছিলেন। এই সময়েই পুরাণগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছিল। গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই যুগে রসায়ন বিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

গুপ্তযুগে ভারতের মনঃশক্তির যে যথার্থই উন্মেষ হইয়াছিল তাহা সে সময়ের বিদ্যা ও চিন্তার নিদর্শন মাত্রেই অনুভব করা যায়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র-শিল্পে সর্ব্বত্রই সমভাবে এই নূতন চিন্তাশীলতা অভি-ব্যক্ত। গুপ্ত স্থাপত্য ও গ্রীসীয় স্থাপত্যের অভিব্যক্তি বস্তুতঃ একইরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, তবে গুপ্ত স্থাপত্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর লালিত্যময়। সারনাথের ধামেক স্তূপের অলঙ্কার সুসঙ্গত অলঙ্করণের একটা উদা-হরণ। ইহার উচ্চতা প্রায় ১১০ ফিট। বৃত্তাকারে যে নক্সাটা ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাতে এই স্তূপ-গাত্রের সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। ধামেক স্তূপের খোদিত অলঙ্কারের শিল্প প্রণালী যেমন সুপরিণত তেমনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর (চিত্র ৯)। ইহার অলঙ্কার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহা নানা প্রকার রেখা বিন্যাস এবং লতা পুষ্প, এই দুই শ্রেণীর শিল্প আভরণে ভূষিত। কিন্তু এই বিভিন্ন আভরণের বৈষম্যের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য এবং ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। নক্সাগুলি অতি পরিষ্কার

ভাবে খোদিত থাকাতে উহাদিগের সৌন্দর্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গুপ্তযুগের অধঃপতন কালীন শিল্প।

খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্তই গুপ্ত শিল্পের উন্নতির সময়। গুপ্ত শিল্পে যে একটী ভাবসম্পদ দেখা যায় সেই সময়ের পর হইতে তাহা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় শিল্পে অতিরিক্ত অলঙ্করণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ আধিপত্য স্থাপন করে। এই অবনতির চিহ্ন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত অজন্তার মন্দিরের স্থাপত্যে লক্ষিত হয়। স্তম্ভের শীর্ষদেশ ও ললাট প্রদেশ অলঙ্করণে এই সময়েও সুগভীর চিন্তাশীলতার এবং সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই অলঙ্করণে বাহুল্য বর্ত্তমান আছে। এই সময় হইতে শিল্পীর চক্ষু অন্তঃসারশূন্য বাহ্য সৌন্দর্য্যের মোহে অন্ধ হইয়াছিল। প্রায় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে শিল্পে অলঙ্কারের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠিল যে তজ্জন্য অলঙ্কৃত বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণ কঠিন হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ এই সময়ে স্তম্ভ ও প্রাচীর গাত্র যেন অলঙ্করণেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং অঙ্গ সমাবেশের সঙ্গতির প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া শিল্পী যেখানে সেখানে চিত্রাঙ্কণ দ্বারা মন্দিরগাত্র পরিশোভিত করিত।

গুপ্তসময়ের বৌদ্ধমূর্ত্তি।

স্থাপত্যের ক্রমোন্নতি, অন্তর্নিহিত চিন্তাশীলতা ও সুসঙ্গতি গুপ্ত স্থাপত্যের বিশেষত্ব। পরবর্ত্তী কালে ইহার

অবনতির যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মন্দিরাদিতে তুল্যরূপে প্রযোজ্য। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের উপাস্য মূর্ত্তিসমূহে একটী বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেব মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রথা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে গ্রীসীয় ভাবানুপ্রাণিত শিল্পকলায় আরম্ভ হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং গান্ধার শিল্পের রীতিপদ্ধতির প্রভাব অন্যান্য শিল্পকলাতে সংক্রামিত হয়। এই সকল কারণে শিল্পের কতকগুলি রীতি এরূপ ভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে পরবর্ত্তী কালের শিল্পীরা কোনরূপে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে গুপ্ত সময়ের ভাস্করগণ সাধারণতঃ অলঙ্করণে যে সুরুচি ও স্বাভাবিকতা দেখাইত বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণে তাহাদিগের পক্ষে সেই গুণপনা দেখান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে গুপ্ত সময়ের শিল্পীদের যথেষ্ট উদ্ভাবনা শক্তি ছিল, সুতরাং তাহারা পূর্ব্বযুগের শিল্পীগণের বিধি ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ ঐ সকল মূর্ত্তি মানসিক কিম্বা আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যে সকল বিভিন্ন মাপ নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে, তাহা বজায় রাখিয়া কিরূপে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিতে শান্তির ও সমাধির ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে এই সমস্যা শিল্পীর মনে উদিত হইয়াছিল, এবং শিল্পী সেই সমস্যার সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিল গুপ্ত মূর্ত্তির মুখমণ্ডল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। সারনাথে প্রাপ্ত বি (বি) ১৮১ সংখ্যক বুদ্ধ মূর্ত্তিতে (চিত্র ৮-ক) শান্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই শান্তি পার্থিব শান্তি নহে। সসীম মানব অসীম আত্মার ধ্যানে রত থাকিলে যে মনোমুগ্ধকর শান্তিছটা সাধকের মুখে প্রকাশ পায় সেই শান্তি এই বুদ্ধ মূর্ত্তিতে প্রকাশমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দয়ার ভাবও মিশ্রিত আছে। যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তথাপি গুপ্তসময়ে শাক্যসিংহ মানবের পালন ও ত্রাণকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ কল্পনাপ্রসূত বৌদ্ধমূর্ত্তিতে দয়ার ভাব প্রকাশের চেষ্টা শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক। বুদ্ধমূর্ত্তিতে শারীরিক সৌন্দর্য্যও বিরাজমান। মুখমণ্ডলের রেখা, সুকোমল হাত ও অঙ্গুলিগুলির গঠন স্বাভাবিক ও সুন্দর। ভাস্কর মূর্ত্তিটীতে শাস্ত্রীয় রীতি বজায় রাখিয়া এই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

মধ্যযুগের শিল্প।

গুপ্তযুগের বৌদ্ধমূর্ত্তিতে যে সকল বিশেষত্বের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সেই সময়কার

হিন্দুদেবমূর্ত্তিতেও দেখা যায়। হিন্দুভাব ও বৌদ্ধভাব সেই সময়ে একই দার্শনিক তত্ত্বে অনুস্যূত ছিল। গুপ্ত সময়ের হিন্দুমূর্ত্তিগুলি বড়ই মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু গুপ্তযুগের অবসানে বৌদ্ধ ও হিন্দুমূর্ত্তি শিল্পে কেমন একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সারনাথে প্রাপ্ত বি (এচ) ১ সংখ্যক শিবমূর্ত্তিতে (চিত্র ৮-খ) ক্রোধাদি ভাবনিচয় প্রকাশের অধিকতর চেষ্টা হইয়াছে তাহা বেশ দৃষ্ট হয়। আশা ও শঙ্কা, জীবন ও মরণ, ভালবাসা ও ঘৃণা এই সকল ভাবের ঘাত প্রতিঘাত মধ্যযুগের হিন্দুমূর্ত্তিগুলিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের শিল্পী অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রেখাপাত দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই; পরন্তু মূর্ত্তির অস্বাভাবিক আকার, অন্ধকার গুহার ক্ষীণ আলো ও গভীর ছায়ায় স্থাপিত করিয়া ভীষণ পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তির সহযোগিতায় ভাবব্যঞ্জনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইলোরার শিল্পে কামক্রোধাদি ভাবসম্পদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যযুগের স্থাপত্যে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সময়কার হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্ত্তিতে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই সকল অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় নাই, বরঞ্চ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মধ্যযুগের শিল্পে আমাদিগের জাতীয় শিল্পের অতি

উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধ্যযুগের শিল্পে গুপ্তশিল্পের জ্ঞানালোক নির্ব্বাণোম্মুখ। ইহা জাতীয় জীবনের অবনতির চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জ্ঞানের অভাবে সম্যক্ দৃষ্টির অভাব ঘটে; এই সম্যক দৃষ্টির অভাবে মূর্ত্তিগুলি প্রাণহীন হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তি যেন কেবল মন্দিরের শোভাবর্দ্ধনের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট।

রাজা কর্ণদেবের লিপি।

পাঠ।

পংক্তি।

১ . . . . . স্ত সর্ব্বান্ধকারব . . . .

২ নিরুপ . . . . . . পারৈকগন্তা(ঃ)
ভুবন

৩ পরমভট্টা[রকমহারাজা][ি]ধরাজপরমেশ্বর
শ্রীবাম [দেব পাদানুধ্যাত-পরমভট্টা]

৪ রকমহারাজ[াধিরাজপর]মেশ্বরপরমমাহেশ্বর
তৃ(ত্রি) [কলিঙ্গাধিপতি নিজভুজো]

৫ পার্জ্জিতাশ্বপতি [গজপতি ন]রপতি রাজত্রয়াধি-
পতিশ্রীমৎকর্ণ[দেবকল্যা]

৬ ণবিজয়রাজ্যে স[ম্বৎসরে ৮]১[০] আশ্বিন
শুদি ১৫ রবৌ ॥ অ[দ্যেহ শ্রীসদ্ধর্ম্ম]

৭ চক্রপ্রবর্ত্তনমহাব . . মহাবিহারে আর্য্য-
ভিক্ষুস্বজনস্ত স্ব . .

৮ পাত্রিকমনোরথগুপ্ত(প্তৌ) আশীর্ব্বাদপদ[ং] সমা-
দাপিতৌ মহাজা[নাম্নুজায়ি]

৯ পরমোপাসকঃ ধনেশ্বরঃ দমনেম(ন) সঞ্জমেন
(সংযমেন) রাগাদিমলপ্রক্ষা(লনপরঃ)

১০ তস্য ভার্জ্জা(ভার্য্যা) মহাজানা-মুজায়িন পরমো-
পাসিকা মামকা যা অতি . . . .

১১ গুণালংকৃৎ(ত)শরীরা তয়া লিখাপিতার্য্য . . .
তা সর্ব্ব-বুদ্ধজন

১২ অষ্টসাহস্রিকা পূজাপঠনিবন্ধনা . . .
ত্তং আচন্দ্রার্কমেদ(দি)-

১৩ নী যাবৎ আর্য্যভিক্ষুসঙ্ঘস্যসমর্পিতঃ . .
বাধকং করে

১৪ [ৎ] স পি(বি)ষ্ঠায়াম্ কৃমির্ভূতো পিত্রি(তৃ)ভিঃ
সহ প[চ্যতে]

অনুবাদ।

পরম ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীবামদেব-পাদানুধ্যায়ী পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমমহেশ্বরভক্ত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি, নিজভুজবলে উপা-র্জ্জিত অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি এই ত্রিরাজপদদ্বয়যুক্ত

শ্রীমান্ কর্ণদেবের কল্যাণবিজয়রাজ্যের ১৮ সংবৎসরের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চদস দিবস, রবিবার।

অদ্য এই শ্রীসদ্ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন মহাবিহারে আর্য্য ভিক্ষুসংঘের স্থবির . . . . . মনোরথ গুপ্তের আশীর্ব্বাদ, মহাযানপথাবলম্বী, পরমোপাসক ধনেশ্বর, যিনি দমন ও সংযমের দ্বারা রাগাদি দোষ প্রক্ষালনে প্রবৃত্ত আছেন এবং তদীয় ভার্য্যা মহাযানপথাবলম্বিণী মামকা, যিনি পরমোপাসিকা ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা . . . . এই উভয়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত রমণী সর্ব্ববুদ্ধজনের পূজার্থে এবং আর্য্যা অষ্টসহাস্রিকার পূজা ও পাঠ নিবন্ধন উহার একখানি নকল করাইয়াছেন। এতদর্থে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর আর্য্য ভিক্ষুসংঘের হস্তে সমর্পিত হইল যে কেহ ইহাতে বাধা উৎপাদন করিবে সে পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠায় কালযাপন করুক।

M

কুমরদেবীর সারনাথপ্রশস্তি।

পাঠ।

পংক্তি

১ ওঁ নমো ভগবত্যৈ আর্য্যবসুধারায়ৈ॥ সমবতু বসুধারা ধর্ম্মপীযূষধারা প্রশমিতবহুবিশ্বো-দ্দামদুঃখোরুধারা। ধনকনকসমৃদ্ধিং ভূর্ভূবঃ স্বঃ কিরন্তী তদ-

২ খিলজনদৈন্যান্যাজয়ন্তী জগন্তি ॥(১) নেত্রৈ-রুৎকণ্ঠিতানাং ক্ষরণমুপনয়ং শ্চারুচন্দ্রোপলানা স্মানগ্রন্থির্বিভিন্দন্ সত কুমুদবনীমুদ্রয়া মানিনীনাম্। দগ্ধন্দগ্ধেশ্বরেণা [মূ]

৩ তনিকরকরৈর্জীবয়ন্ কামদেবং কান্তোয়ং কৌমূ-দীনাং স জয়তি জগদালোকদীপ্রপ্রদীপঃ ॥[২] বংশে তস্য নমস্যপৌরুষজুষি প্রস্ফারকীর্ত্তি-ত্বিষি দ্রাক্ শৌচেন সু [রাপ]-

৪ গামদমুষি প্রত্যর্থিলক্ষ্মীরুষি। বীরো বল্লভ-রাজনামবিদিতো মান্য স ভূমীভুজাং জেতাসীৎ-পৃথুপাঠিকাপতিরতিপ্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ ॥[৩]
ছিক্কোরবংশকুমুদোদয়পূর্ণ—

৫ চন্দ্রঃ শ্রীদেবরক্ষিত ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্। পীঠিপতি র্গজপতেরপি রাজ্যলক্ষ্মীং লক্ষ্যা

জিগায় জগদেকমনোহরশ্রীঃ॥[৪] তস্মাদাস
পয়োনিধেরিব বিধু-

৬ র্ল্লাবণ্যলক্ষ্মাবিধুর্নেত্রানন্দসমুদ্রবর্দ্ধনবিধুঃ কীর্ত্তি-
দ্যুতি শ্রীবিধুঃ। সৌজন্যৈকনিধিঃ স্ফুরদ্গুণ-
নিধির্গাম্ভীর্য্যবারান্নিধির্হর্ম্মাদ্বৈতনিধিঃ স চা[ত্তি]
ম-

৭ নিধিঃ শস্ত্রৈকবিদ্যানিধিঃ ॥[৫] দীনানামভিবা-
ঞ্ছিতৈকফলদঃ প্রত্যক্ষকল্পদ্রুমো দৃপ্যদ্বৈরি-
গিরীন্দ্রভেদনবিধৌ দুর্বারবজ্রশ্চ যঃ। কান্তা-
ন[া]স্মদ-

৮ নজ্বরোপশমনে সিদ্ধৌষধীপল্লবো বাহুর্যস্য বভূব
ভূতলভুজামন্তশ্চমৎকারিণঃ ॥[৬] গৌড়েদ্বৈ-
তভটঃ সকাণ্ডপটিকঃ ক্ষত্রৈকচূড়ামণিঃপ্রখ্যাতো

৯ মহণাঙ্গপঃ ক্ষিতিভুজাম্মাম্ন্যোভবন্মাতুলঃ। ত(তং)
জিত্বা যুধি দেবরক্ষিতমধাৎ শ্রীরামপালস্য
যো লক্ষ্মীং নির্জিতবৈরিরোধনতয়া দেদীপ্য-
মানোদয়াম্ ॥[৭] কন্যা মহণ-

১০ দেবস্য তস্য কন্যেব ভূভৃতঃ। সা পীঠীপতিনা
তেন তেনেবোঢ়া স্বয়ম্ভূ[ভু] বা ॥[৮] খ্যাতা
শঙ্করদেবীতি তারেব করুণাশয়া। ব্যজেষ্ট
কল্পবৃক্ষাণাং লতা দানোদ্যমেন যা ॥ [৯]অ-

১১ জনি কুমরদেবী হন্ত দেবীব তাভ্যাং শরদমলসু-
ধাংশোশ্চারুলেখেব রম্যা। দুরিতজলধি-
মধ্যাল্লোকমুদ্ধর্ত্তুকামা স্বয়মিহ করুণার্ত্তা
তারিণীবাবতার্ণা ॥[১০]

১২ যাম্বেধাঃ প্রবিধায় শিল্পরচনাচাতুর্য্যদর্পং ব্যাধা-
দ্যদ্বক্ত্রেণ জিতস্তুষারাকরণো ক্ষীণঃ স খস্থো-
ভবৎ। রাত্রারাগমাতনোতি মলিনোজাতঃ
কলঙ্কী ততস্ত

১৩ স্যাঃ সুদ(সুন্দ)রিমা স বিস্ময়করো বাচ্যঃ
কিমস্মাদৃশৈঃ ॥[১১] চিত্রঞ্চঞ্চলদৃক্কুরঙ্গ-
মবধূবদ্ধস্ফুরদ্দাগুরাম্ বিভ্রাণা তনুসম্পদম্প্র-
বিলসৎকান্ত্যাভিকান্তশ্রিয়া।

১৪ খেলৎক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরীলাবণ্যলক্ষ্মীমুষংমোষং
শৈলসুতামদস্য দধতী সৌভাগ্যগর্বেণ
সা ॥[১২] ধর্মাদ্বৈতমতির্গুণাহিতরতিঃ প্রার-
ব্ধপুণ্যাচিতি-

১৫ দানোদারধৃতির্মতঙ্গজগতির্নেন্‌া(ত্রা)ভিরামা-
কৃতিঃ। শাস্তৃন্যস্তনতির্জনোদিতনুতিঃ
কারুণ্যকেলিস্থিতির্নিত্যশ্রীবসতিঃ কৃতায-
বিহৃতিঃ স্ফায়দ্গুণাহংকৃ

১৬ তিঃ ॥[১৩] জগতি গহডবালে ক্ষত্রব[ং]শে
প্রসিদ্ধেজনি নরপতিচন্দ্রশ্চন্দ্র(মা)নামা
নরেন্দ্রঃ। যদসহননৃপাণাঙ্কামিনীবাষ্পবা
হেঃ(হৈ) শিতিতরমিদমাসাদ্যামুন(নং) তূ(মূ)
নমস্তুঃ ॥[১৪] নৃ

১৭ পতিমদনচন্দ্রশ্চণ্ডভূপালচূড়ামণিরজনি স তস্মা-
দ্বিভ্রদেকাতপত্র[ম্]। ধরাণতলমনল্পপ্রৌঢ়-
তেড়ো(জো)নলশ্রীঃশ্রিয়মপি চ মঘোনঃ
স্বশ্রিয়াধো দধানঃ ॥[১৫] বারাণ-

১৮ সীং ভুবনরক্ষণদক্ষ একো দুষ্টান্তুরুষ্কসুভটাদ
বিতুং হরেণ। উক্তো হরিশ্চ পুনরত্র বভূব
তস্মাদ্গোবিন্দচন্দ্র ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥
[১৬] বৎসাঃ কামদুহাং কণা-

১৯ নপি পয়ঃপূরস্য পাতু ন তে চিত্রং প্রাগলভস্য
যাচকমনঃ সন্তোষনিত্যব্যয়াৎ। ত্যাগৈ-
র্যস্য মহাভুজঃ প্রমুদিতে তদ্যাচকানাঞ্চয়ে
স্বচ্ছন্দাহিতনিত্যনির্ভরপয়ঃ-

২০ পানোৎসবৈরাসতে ॥[১৭] যদ্বিদ্বেষিমহীভূজাং
পুরবরে প্রভ্রষ্টহারাবলী ব্যাধাস্তন্মৃগপাশবন্ধ-
মনসা গৃহ্নন্তি নৈব ভ্রমাৎ। ব্যাধাঃ স্রস্ত-
সুবর্ণকুণ্ডলমহিভ্রান্ত্যা

২১ তদত্যায়তের্দৈত্যৈদ্রাগপসারয়স্তি চ ভয়প্রোৎকম্পি
হস্তস্রজঃ ॥[১৮] যস্তোৎসন্নবিরোধিভূপ-
তিপুরপ্রাসাদপৃষ্ঠোপরি প্রত্যগ্রস্ফুরদুগ্র-
শষ্পকবলব্যালোলবাজি-

২২ ব্রজঃ। আদিত্যস্ত্বভবৎস মন্তররথশ্চন্দ্রোপি
মন্দোভবৎ ঘাসগ্রাসবিরুদ্ধলোভহরিণ রক্ষন্
পতন্তস্ততঃ ॥[১৯] অহহ কুমরদেবী তেন
র(া)জ্ঞা প্রসিদ্ধা ন্রি(ত্রি)জগতি

২৩ পরিগীতা শ্রীরিবেহাচ্যুতেন। প্রবিলসদবরোধে
তস্য রাজ্ঞোঙ্গনানাং নিয়তমমৃতরশ্মের্লেখিকা
তারকাসু ॥[২০] বীহারো নবখণ্ডমণ্ডল-
মহাহারকৃতোয়স্তয়া

২৪ তারিণ্যা বসুধারয়া ননু বপুর্বিভ্রাণয়ালংকৃতঃ
যং দৃষ্ট্বা প্রবিচিত্রশিল্পরচনাচাতুর্য্যসীমাশ্রয়ং
গীর্বাণৈঃ সুদৃশ[শ্চ] বিস্ময়মগাদ্দ্রাগ্বিশ্বকর্ম্মা-
পি সঃ।(॥)[২১] শ্রীধর্মচক্রজি-

২৫ নশাসনসন্নিবদ্ধং সা জম্বুকী সকলপত্তলিবা-
গ্রভূতা। তত্তাম্রশাসনবর(রং) প্রবিধায় তস্মৈ
দত্বা তয়া শশিরবী ভুবি যাবদাস্তাম্ ॥[২২]
ধর্মাশোকনরাধিপস্য সময়ে শ্রীধ-

২৬ ম(র্ম) চক্রো জিনো যাদৃক্ তন্নয়রক্ষিতঃ পুন-
রয়ঞ্চক্রে ততোপ্যদ্ভুতম্। বীহারঃস্থবিরস্য
তস্য চ তয়া যত্নাদয়ঙ্কারিত স্তস্মিন্নেব সমর্পি-
তশ্চ বসতাদাচন্দ্রচণ্ডদ্যুতি ॥[২৩] তৎ-
কীর্তিস্প-

২৭ রিপালয়িষ্যতি জনো যঃ কশ্চিদুর্বীতলে স
তস্যাঙ্ঘ্রিংযুগপ্রণামপরমা স্বয়ং জিনাঃ সাক্ষি-
ণঃ। তস্যা কশ্চিদনিশ্চিতো যদি যশোব্যা-
লোপকারা খলঃ তং পাপীয়সমা-

২৮ শু শাসতি পুনস্তে লোকপালাঃ ক্রুধা ॥[২৪]
একস্তীর্থিকবাদিবারণঘটাসজ্ঘট্টকণ্ঠীরবঃ
সাহিত্যো[জ্]জ্বলরত্নরোহণগিরির্যো হৃষ্ট-
ভাষাকবিঃ। খ্যাতো বঙ্গমহীভুজ:

২৯ প্রণয়ভূঃ শ্রীকুন্দনামা কৃতী তস্যাঃ সুন্দরবর্ণগুম্ফর-
চনারম্যাং প্রশস্তিং ব্যধাৎ ॥[২৫] এষা
প্রশস্তিরুৎকীর্ণা বামনেন তু শিল্পিনা। রাজা-
বর্ত্তস্য সাপত্নন্দধানে প্রস্তরোত্তমে ॥[২৬]

অনুবাদ

পংক্তি

১।২ ওঁ। ভগবতী আর্য্যাবসুধারাকে প্রণাম। যিনি ধর্ম্মের পীযূষধারায় বহু বিশ্বের উদ্দাম দুঃখধারা প্রশমিত করেন, যিনি ত্রিলোকে ধনকনকসমৃদ্ধি বিকীরণ করেন, যিনি অখিল জনগণের দুঃখ শমিত করিয়া দেন, সেই বসুধারা দেবী জগৎকে পালন করুন।

২।৩ চন্দ্রকান্তমণিসমূহের ক্ষরণকারী, উৎকণ্ঠিতগণের নেত্রাদ্রকারী, মানিনীগণের মানগ্রন্থি-ভিন্দনকারী, মুদ্রিত কুমুদকুলের প্রস্ফুটনকারী, মহেশ্বর কর্ত্তৃক ভস্মীভূত কামদেবের অমৃতবর্ষীকরনিকরে পুনরুজ্জীবনকারী, জগতের আলোকবিধাতা সেই কুমুদিনীকান্ত জয়যুক্ত হউন।

৩।৪ তাঁহার বংশে পৌরুষে নমস্য, কীর্ত্তিতে দীপ্তিমান, শুদ্ধিতে সুরনদীর স্পর্দ্ধাকারী, প্রতিপক্ষদের লক্ষীবিনস্টা ভূপতিদের মান্য, বিশাল পীঠিকার অধিপতি বল্লভরাজা নামে এক বীর ছিলেন, যাঁহার প্রতাপ বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

৪।৫ ছিক্কোরবংশের কুমুদোদয়কারী পূর্ণচন্দ্র ছিলেন সেই পীঠীপতি, যিনি শ্রীদেবরক্ষিত নামে পৃথিবীতে প্রথিত। তাঁহার রাজ্য-লক্ষ্মী গজপতির লক্ষ্মীকে অতিক্রম করিয়াছিল, যাঁহার শ্রী একাই জগতের মনোহরণ করিত।

৫।৬ পয়োনিধি হইতে বিধুর মত তিনি সেই (বল্লভরাজ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, লাবণ্যলক্ষ্মীর কাছে যিনি বিধুই ছিলেন। তিনি সমুদ্র হইতে উদয়কালে বিধুর মতই নেত্রানন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন। কীর্ত্তিশ্রীই সেই বিধুর দ্যুতি ছিল। তিনি সৌজন্যে অতুলনীয় দীপ্তিমান গুণসমূহের নিধি সিন্ধুর মত গম্ভীর ছিলেন।

৭ তিনি ধর্ম্মের একমাত্র আকর, শক্তি এবং শস্ত্রবিদ্যার একমাত্র আকর এবং দীনগণের অভিবাঞ্ছিত একমাত্র ফলপ্রদাতা প্রত্যক্ষ কল্পতরু ছিলেন। দৃপ্ত বৈরীরূপ গিরীন্দ্রগণের ভেদনকার্য্যে তিনি দুর্ব্বার বজ্রের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার বাহুপল্লব কান্তাগণের

৮ মদনজ্বরের উপশমে সিদ্ধৌষধি ছিল। এবং ভূপতিগণের অন্তর চমৎকৃত করিত। (৬) গৌড়দেশে অদ্বিতীয় বীর

৯ শরশালি এক ক্ষত্রিয়চূড়ামণি ছিলেন। তিনি ক্ষিতিপতিগণের মাননীয় মাতুল স্বনামখ্যাত মহণ। তিনি দেবরক্ষিতকে যুদ্ধে জয় করিয়া, বৈরীবিরোধ নির্জিত করিয়া শ্রীরামপালের রাজ্যলক্ষ্মীকে দেদীপ্যমান করিয়া দিয়াছিলেন। (৭) মহণদেবের কন্যা

১০ অদ্রিকন্যার ন্যায় ছিলেন। পার্ব্বতী যেমন স্বয়ম্ভুর সহিত, তিনিও তেমন পীঠীপতির সহিত বিবাহিতা হন।(৮) তিনি শঙ্করদেবী নামে প্রসিদ্ধা এবং তারার ন্যায় করুণাশয়া ছিলেন। কল্পবৃক্ষ লতাকে দান বিষয়ে তিনি পরাভূত করিয়াছিলেন।(৯)

১১ এই দম্পতী হইতে দেবীর মতই কুমরদেবী সম্ভূত হন। তিনি শরৎকালের অমল সুধাংশুর চারুলেখার ন্যায় রমণীয়া। যেন পাপজলধির মধ্য হইতে লোকোদ্ধারের

ইচ্ছায় করুণার্ত্ততারিণী স্বয়ং ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।(১০)

১২ যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া বিধাতার শিল্পরচনা-চাতুর্য্যের দর্প হইয়াছিল। (১১) যাঁহার মুখ-কান্তিতে পরাজিত হইয়া তুষারমালী লজ্জায় আকাশ আশ্রয় করিয়াছেন, রাত্রিতে মাত্র উদিত হন, মলিন হইয়া গিয়াছেন এবং কলঙ্কিত হইয়াছেন—

১৩ তাঁহার সেই বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য আমাদের স্থায় লোকে কি ব্যক্ত করিবে। (৬৬) তাঁহার বিভ্রমকর তনুসম্পদ ক্ষণিকদর্শনকারী চঞ্চলনয়নকুরঙ্গদ্বয়ের পক্ষে বিস্তারিত বাগুরার ন্যায় প্রতিভাত হইত।

১৪ তিনি ক্ষীরসমুদ্রের ক্রীড়াশীল মনোজ্ঞ লহরী-গণের লাবণ্যলক্ষ্মী দীপ্তস্ত্রীশোভার দ্বারা হরণ করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যগরিমা শৈলতনয়ার অহঙ্কার নষ্ট করিয়াছিল।(১২)

১৫ ধর্ম্মে তিনি একমতি, গুণেই তাঁহার রতি, পুণ্য সঞ্চয়ে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন।

দানে তিনি পরম তুষ্টি লাভ করেন। তাঁহার গতি মাতঙ্গের ন্যায়, অকৃতি নেত্রসুখকর। জগৎপতির নিকট তিনি নত, জনগণ তাঁহার প্রশংসা করে। কারুণ্যকেলিতে তাঁহার স্থিতি, নিত্যশ্রীর তিনি আবাস ভূমি, কুকর্ম্মকে তিনি জয় করিয়াছেন, অশেষগুণ সম্ভারই তাঁর অহঙ্কারের বস্তু।(১৩)

১৬ জগৎপ্রসিদ্ধ গহড়বাল নামক ক্ষত্রিয়বংশে নরপতিগণের চন্দ্রস্বরূপ চন্দ্র নামে এক নরেন্দ্র ছিলেন। যে সকল ভূপতি তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারেন নাই তাঁহাদের কামিনীগণের নয়ন জলধারায় যমুনা সত্যই কৃষ্ণতবা হইয়াছিলেন। (১৪)

১৭ চণ্ডভূপালগণের চড়ামণি মদনচন্দ্র তাঁহা হইতে উৎপন্ন হন। ধরণীতল তিনি একছত্র হইয়া ধারণ পোষণ করেন। তাঁহার তেজানল প্রচণ্ড ও প্রসিদ্ধ ছিল। আত্ম-শ্রীর দ্বারা তিনি ইন্দ্রের শ্রীকে অবনত করিয়াছিলেন।(১৫)

১৮ মহাদেব হরিকে, দুষ্ট তুরুষ্কবীর হইতে বারাণসী পুরী রক্ষায় একমাত্র দক্ষ বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছিলেন। সেই হরিই তাঁহা (মদনচন্দ্র) হইতে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দচন্দ্র নামে তিনি প্রসিদ্ধ হন। (১৬) কামধেনু-গণের বৎসগণ

১৯ পূর্ব্বে দুগ্ধধারার কণাও প্রাপ্ত হইতনা, যাচক-গণের মনস্তুষ্টির জন্য তাহা নিত্যই ব্যয়িত হইয়া যাইত। এই মহীপতির দানে যাচকগণ প্রমুদিত হইলে তাহারা স্বেচ্ছানুযায়ী

২০ অজস্র দুগ্ধপানোৎসবে অবস্থিতি করিত।(১৭) তাঁহার বিদ্বেষী নরপতিগণের পুরসমূহে ব্যাধগণ স্রস্ত হারগুলি মৃগগণের পাশবন্ধ করিবে বলিয়া গ্রহণ করে, ভ্রমক্রমে নহে, ভূপতিত সুবর্ণকুণ্ডল সমূহকে বৃহদাকার-বশতঃ সর্পভ্রমে

২১ ভয়ার্ত্ত কম্পিতহস্তে দণ্ডদ্বারা দ্রুত অপসৃত করে। (১৮)

২১-২২ যাঁহার উৎসন্ন বিরোধিরাজগণের পুর প্রাসাদের পৃষ্ঠোপরি নবস্ফুরিত শষ্প-কবলেলুব্ধ অশ্বগণ আদিত্যকে স্তম্ভিত

করিয়াছিল-তিনি মন্থর রথ হইয়াছিলেন। চন্দ্রও তৃণলুব্ধ পতনোন্মুখ হরিণকে ধারণ করিতে গিয়া মন্দগতি হইয়াছিলেন।(১৯)

২২-২৩ যথার্থই কুমরদেবী সেই রাজার সহিত শ্রী যেমন অচ্যুতের সহিত—তেমনি প্রসিদ্ধা ও ত্রিজগতে কীর্ত্তিতা হন। সেই রাজার অবরোধে অঙ্গনাসমূহের মধ্যে, তারকার মধ্যে যেমন চন্দ্রলেখা তেমনি শোভিত হন। (২০) নবখণ্ডমণ্ডলে বিভক্ত ধরণীর হার স্বরূপ এই বিহার তাঁহার কৃত।

২৪ ইহা যেন তারিণী বসুধারা কর্ত্তৃক দেহশোভার্থে অলঙ্কৃত হইয়াছে। দেবলোকের ন্যায় সুদৃশ্য ইহার বিচিত্র শিল্পরচনাচাতুর্য্য দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা নিজেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছেন।(২১) শ্রীধর্ম্মচক্র জিনের

২৫ শাসন যাহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া, পত্তলিকা সমূহের অগ্রভূতা জম্বুকীকে, যত কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সূর্য্যচন্দ্র থাকিবে ততদিন

পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল। (২২) ধর্ম্মাশোক নরপতির সময়ে শ্রী

২৬ ধর্ম্মচক্রজিন যেরূপ রক্ষিত ছিল পুনরপি সেইরূপ, এমনকি তাহা হইতে অদ্ভুততর রূপে রক্ষিত করা হইয়াছে। সেই স্থবিরের জন্য এই বিহার সযত্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে (সেই বিহারে) স্থাপিত হইয়া তিনি যত দিন সূর্য্য চন্দ্র থাকিবে—বাস করুন। (২৩) তাঁহার (কুমরদেবীর) কীর্ত্তি

২৭ ভূমিতলে যে কোন লোক পরিপালন করিবে, তাঁহার পদযুগে প্রণামপর হে জিনসকল তোমরা সাক্ষী থাকিও। যদি কোন খল তাঁহার (কুমর দেবীর) যশ লোপ করে

২৭-২৮ তবে সেই লোকপালগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পাপাত্মাকে আশু শাসন করিবে। (২৪) হস্তিগোষ্ঠিরূপ তীর্থিকবাদগণের যুদ্ধে যিনি একমাত্র সিংহ, যিনি সাহিত্যে রত্নোজ্জ্বল রোহণ গিরি, যিনি অষ্টভাষায় কবি, বঙ্গেশ্বরের

২৯ প্রণয়পাত্র বলিয়া খ্যাত, যাঁহার নাম শ্রী কুন্দ তিনি তাঁহার (কুমরদেবীর) এই সুন্দর, বর্ণালঙ্কারে রম্যা প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। (২৫) এই প্রশস্তি রাজাবর্ত্তের তুল্যস্পর্দ্ধী উত্তমপ্রস্তরে শিল্পি বামনের দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে। (২৬)

MGIPC—S7—X-3-61—14-12-27—500.

চিত্র ১